মিথ্যা, ওয়াদা ভঙ্গ ও খেয়ানতের বিভিন্ন রূপ

মূল: বিচারপতি মুফতী মুহাম্মাদ তকী উসমানী

অনুবাদ

হাফেয মাওলানা আবু সাঈদ

শিক্ষক: মুহাম্মাদিয়া হাফেযিয়া মাদ্রাসা

গ্রীন রোড, ঢাকা, স্টাফ কোয়ার্টার,

আ খ ম ইউনুস

এফ.এম., এম.এম.

বি.এ. অনার্স, এম.এ (প্রথম শ্রেণীতে প্রথম)

এম.ফিল., (ডি ইউ)

সহকারী অধ্যাপক

দর্শন বিভাগ, ঢাকা সিটি কলেজ

ঢাকা ১২০৫

আল হিকমাহ্ পাবলিকেশন্স

ঢাকা, বাংলাদেশ

অনুবাদকের মিনতি

আলহামদু লিল্লাহ! সর্ববিধ প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের, যিনি দয়ালু-দয়াবান, যিনি মানবজাতির ইহ ও পরকালীন মুক্তির জন্য পূর্ণাঙ্গ বিধান-আল কুরআন দিয়েছেন এবং যাঁর নিকট সমগ্র মানবজাতি প্রত্যাবর্তিত হবে। অসংখ্য দরুদ ও সালাম সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স.) এর প্রতি, যিনি মানবজাতির জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরিত হয়েছেন এবং যিনি মানবজাতির জন্য সর্বোত্তম আদর্শ। তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবাদের প্রতিও দরুদ ও সালাম।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবন চিরস্থায়ী। এবং সকল মানবকেই মৃত্যুর পরে সেই স্থায়ী জীবনের সম্মুখীন হতে হবে। আর সেখানে মানবের জন্য অপেক্ষা করছে জান্নাত বা জাহান্নাম। জান্নাত নিরঙ্কুশ সুখ-শান্তি ও যথেচ্ছ উপভোগের আবাস স্থল। পক্ষান্তরে জাহান্নাম বেদনাক্লিষ্ট আযাবের স্থান। সাধারণভাবে এটাই জীবনের উদ্দেশ্য যে, পরজীবনে জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্তি এবং জান্নাতের অফুরন্ত সুখ-শান্তি লাভ করা। এ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ইহজগতেই আমল বা চেষ্টা-তদবির করতে হবে। নিজেকে নিরন্তর সাধনায় নিয়োজিত রাখতে হবে। এ সাধনা করতে হবে আল্লাহর দেয়া বিধান এবং নবী (স.)এর কুরআন ও সুন্নাহ মুতাবেক। এর ব্যতিক্রম আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না।

'আমল করার ক্ষেত্রে অনেক সময় আমরা গলদ করে ফেলতে পারি। এটা স্বেচ্ছায় হতে পারে, অনিচ্ছায় হতে পারে, আবার মাছয়ালা না জানা বা না বোঝার কারণেও হতে পারে, আবার ছওয়াবের কাজ মনে করে পাপের কাজও হয়ে যেতে পারে। এমন কয়েকটি বিষয়, যেমন- **মিথ্যা বলা বা মিথ্যা সাক্ষ্য** দেওয়া, ওয়াদা **ভঙ্গ করা** এবং **খেয়ানত করা** ইত্যাদি সম্পর্কে খ্যাতনামা ইসলামী চিন্তাবিদ, হাক্কানী আলেম ও মুফতি, বিচারপতি মুহাম্মাদ তকী উসমানী (দাঃ বাঃ) পাকিস্তানে পরপর

কয়েকটি জুম'য়ায় আলোচনা করেছেন। তিনি কুরআন ও হাদীসের আলোকে অত্যন্ত যুক্তির সাথে বিষয়গুলোর হৃদয়স্পর্শী বর্ণনা করেছেন। দেওবন্দের সিদ্দীকী কিতাব ঘর তাঁর এই খুতবাগুলোকে *'আলামাতে মুনাফিক'* নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছে। অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে এবং আমাদের অসর্তকতার কারণে নানাভাবে মিথ্যা সংঘটিত হয়, অনুরূপ নানাভোবে ওয়াদা ভঙ্গ এবং আমানতের খেয়ানত আমাদের দ্বারা হয়ে থাকে। এসব বিষয়ের কুরআন ও হাদীস ভিত্তিক আলোচনা গ্রন্থটিতে রয়েছে। গ্রন্থটি প্রত্যেক নর-নারীর অবশ্য পাঠ্য। তাই বাংলা ভাষাভাষীদের নিকট তুলে ধরার জন্য আমরা গ্রন্থটি *মিথ্যা, ওয়াদা ভঙ্গ* ও *খেয়ানতের বিভিন্ন রূপ* শিরোনামে অনুবাদের প্রয়াস পেয়েছি। আল হিকমাহ্ পাবলিকেশন্স গ্রন্থটি প্রকাশ ও প্রচারের উদ্যোগ নেয়ায় আমরা এর কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের ও প্রকাশকের উদ্যোগকে কবুল করুন। আমীন।

ঢাকা
১০ জুলাই, ২০০৩

বিনীত
অনুবাদকদ্বয়

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়
মিথ্যা ও তার বিভিন্ন রূপ

দ্বিতীয় অধ্যায়
ওয়াদা ভঙ্গ ও তার বিভিন্ন রূপ

তৃতীয় অধ্যায়
খেয়ানত ও তার বিভিন্ন রূপ

بسم الله الرحمن الرحيم

১ম অধ্যায়
মিথ্যা ও তার বিভিন্ন রূপ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ ـ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَاهَادِىَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَه، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ـ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا ـ

বর্তমানে মিথ্যা আমাদের জীবন-যাপনে এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে, যেমনভাবে রগে রগে রক্ত বিস্তার করে থাকে। চাল-চালনে ওঠা-বসায় মুখ দ্বারা মিথ্যা বের হয়। কোন কোন সময় বিদ্রূপের লক্ষ্যে কখনও স্বার্থ অর্জন করার উদ্দেশ্যে, আবার কখনও নিজের বড়ত্ব জাহির করার জন্যে আমরা মিথ্যা বলে থাকি। ব্যাপকভাবে এর প্রচলন হয়ে যাচ্ছে। এর প্রচলন এমন ব্যাপক হয়েছে যে মানুষ একে অবৈধ বা গুনাহ বলেই মনে করেনা। বরং মানুষ বুঝে থাকে যে, এরূপ মিথ্যাচার আমাদের সৎকর্মের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করবে না। এটা মুনাফিকের এক বড় লক্ষণ।

মুনাফিকের তিনটি 'আলামত

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اٰيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ : اِذَ حَدَّثَ كَذَّبَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ، وَاِذَا أُؤْمِنَ خَانَ فِىْ رِوَايَةِ وَاِنْ صَامَ وَصَلّٰى وَزَعَمَ اَنَّهٗ مُسْلِمٌ .

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, এমন তিনটি স্বভাব রয়েছে যা মুনাফিক হবার নমুনা। অর্থাৎ কোন মুসলমানের মধ্যে এরূপ স্বভাব থাকা সমীচীন নয়। কারো মাঝে যদি এ তিনটি স্বভাব পাওয়া যায় তাহলে বুঝতে হবে সে মুনাফিক। স্বভাব তিনটি হচ্ছে : "যখন সে কথা বলে তখন মিথ্যা বলে যখন প্রতিশ্রুতি দিবে তা ভঙ্গ করে এবং তার নিকট কোন কিছু গচ্ছিত রাখলে তা আত্মসাৎ করে। এক রেওয়ায়েতে এও বর্ণিত রয়েছে যে, যদিও সিয়াম পালন করে নামায আদায় করে এবং মুসলমানিত্বের দাবীও করে। *(সহীহ বুখারী, কিতাবুল ঈমান, আলামতে মুনাফিক অনুচ্ছেদ, হাদীস নং ঃ ৩৩)* প্রকৃতপক্ষে মুসলমান দাবী করার তার কোন অধিকার নেই। কারণ মুসলমান হবার যে সকল মৌলিক গুণাবলি রয়েছে তা থেকে সে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে।"

ইসলাম একটি প্রশস্ত ধর্ম

আল্লাহ তা'আলাই জানেন যে, কোথা হতে আমাদের মেধায় এ চিন্তা বদ্ধমূল হয়েছে এবং আমরা এ কথা বুঝে নিয়েছি যে, শুধু নামায-রোযার নামই হচ্ছে ধর্ম। নামায আদায় করছি, রোজা রাখছি এবং নামায-রোযার ইন্তেযাম করছি এতেই মুসলমান হয়ে গেলাম। এর চেয়ে বেশী আর কোন কিছু আমাদের করণীয় নেই। এজন্যেই যখন বাজারে যাওয়া হয় সেখানে মিথ্যা ও প্রতারণার মাধ্যমে মালামাল সংগ্রহ করা হচ্ছে। হারাম ও হালাল একাকার হয়ে যাচ্ছে। এ বিষয়ে কোন প্রকারের ভাবনা নেই। জবানের কোন আস্থা নেই। গচ্ছিত মালের উপর আত্মসাৎ করা হচ্ছে। অঙ্গীকার পালনের প্রতি কোন গুরুত্ব নেই। সুতরাং ইসলামের ব্যাপারে শুধু এতটুকু ধারণা যে ইসলাম কেবলমাত্র নামায-রোযার নাম। ইহা অত্যন্ত ভয়াবহ ও ভ্রান্ত ধারণা। হুজুর (সা.) বলেন এমন ব্যক্তি চাই নামায পড়ুক, রোযা রাখুক তথাপি তাকে মুসলমান বলা ঠিক নয়। আবার তাদের উপর কুফরীর ফাতওয়া দেওয়াও ঠিক নয়। কারণ কুফুরীর ফাতওয়া দেয়া বড়ই কঠিন বিষয়। ফাতওয়া দিয়ে এসব লোককে কাফের বলে চিহ্নিত করবে না এবং ইসলামের গণ্ডী হতে খারিজও করবে না। যদিও এ প্রকৃতির লোকেরা যাবতীয় কাজ কাফের ও মুনাফিকের ন্যায় করে থাকে। উপরে বর্ণিত হাদীসে মুনাফিকের তিনটি আলামতের কথা বলা হয়েছে যথা : (১) মিথ্যা বলা (২) অঙ্গীকার ভঙ্গ করা (৩) গচ্ছিত মাল আত্মসাৎ করা। এ তিনটি বিষয়কে কিছু ব্যাখ্যা দানের সাথে পেশ করতে ইচ্ছে করছি। কারণ সচরাচর আমরা সাধারণ লোকেরা এ তিনটি বিষয় নিয়ে নিতান্তই কম চিন্তা-ভাবনা করে থাকি। অথচ এ তিনটি স্বভাব ব্যাপক তাৎপর্যবহ। অতএব এর কিছু ব্যাখ্যা দানের প্রয়োজন রয়েছে।

আইয়্যামে জাহিলিয়্যাতে মিথ্যার অবস্থান

বর্ণিত রয়েছে যে, সর্ব প্রথম বিষয় হলো মিথ্যা বলা। মিথ্যা বলা হারাম। এমন কোন ধর্ম বা জাতি অতিবাহিত হয়নি যাদের মধ্য মিথ্যা বলা হারাম বিবেচিত ছিল না। এমনকি জাহিলিয়্যাত যুগেও মিথ্যা বলাকে খারাপ মনে করা হতো । একটা ঘটনা স্মর্তব্য যে, হুযুর আকরাম (সা.) রোম সম্রাটের নিকট ইসলামের দাওয়াত দিয়ে পত্র প্রেরণ করলেন। রোম সম্রাট পত্র পাঠ করার পর নিজ সভাসদগণকে বললেন, আমাদের দেশে যদি এমন কোন লোক থাকে যে যুবক মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে জ্ঞাত রয়েছে; তাহলে তাকে আমার নিকট পাঠিয়ে দিবে। যাতে করে আমি তার কাছ থেকে তিনি কেমন ব্যক্তি সে সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারি। হযরত আবু সুফিয়ান (রা.) তখনও মুসলমান হননি। ঘটনাক্রমে ঐ সময় একটি ব্যবসায়ী কাফেলা নিয়ে তিনি সেখানে গিয়েছিলেন। সুতরাং লোকেরা তাঁকে বাদশাহর নিকট নিয়ে আসে। তিনি বাদশাহর নিকট পৌঁছলে বাদশাহ তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে আরম্ভ করেন। সর্বপ্রথম এই প্রশ্ন করেন যে, আপনি বলুনতো তিনি মুহাম্মদ (সা.) কোন বংশের লোক ও কোন শ্রেণীর বংশ ? তার খ্যাতি রয়েছে কেমন ? তখন তিনি জবাবে বললেন যে, তাঁর বংশ শ্রেষ্ঠ স্তরের। শ্রেষ্ঠ বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন। সারা আরব জুড়ে তাঁর বংশের সুখ্যাতি রয়েছে। বাদশাহ সত্যতা স্বীকার করে বললেন যে, সম্পূর্ণই ঠিক। যিনি আল্লাহর নবী হন তিনি শ্রেষ্ঠ বংশেই জন্মগ্রহণ করে থাকেন। অতঃপর বাদশাহ দ্বিতীয় প্রশ্ন করলেন। বাদশাহ জিজ্ঞাসা করলেন– তার অনুসারীরা কি সাধারণ লোক না কি বড় বড় নেতৃবর্গীয় লোকজন ? তিনি জবাবে বললেন যে, তাঁর অনুসারীরা অধিকাংশই সাধারণ প্রকৃতির লোক। বাদশাহ সত্যতা স্বীকার করে বললেন যে, নবীগণের অনুসারীরা প্রথমত নিঃস্ব ও দুর্বল প্রকৃতির লোকজনই হয়ে থাকেন। তারপর প্রশ্ন করলেন তোমাদের সাথে যখন তার যুদ্ধ হয়, তখন কি তোমরা বিজয় লাভ কর না তিনি বিজয় লাভ করে থাকেন ? সে সময় পর্যন্ত যেহেতু মাত্র দু'টি যুদ্ধ হয়েছিল একটি বদর যুদ্ধ অপরটি ওহুদ যুদ্ধ। ওহুদ যুদ্ধে যেহেতু মুসলমানদের আংশিক পরাজয় হয়েছিল, সে জন্যেই তিনি তখন জবাব দেন যে, কখনও আমরা বিজয়ী হই আবার কখনও তারা বিজয়ী হয়।

মিথ্যা বলতে পারছিলেন না

হযরত আবু সুফিয়ান (রা.) মুসলমান হয়ে বলেছিলেন যে, তৎকালে আমি কাফের ছিলাম। তাই আমার মধ্যে এই ফিকির ছিল যে, আমি এমন একটি বাক্য বলে দেব যার দ্বারা হুযূর (সা.)-এর বিপক্ষে কোন প্রকারের প্রভাব ফেলতে পারি। কিন্তু বাদশাহ যে সকল প্রশ্ন করল তার জবাবে ঐ ধরনের কিছু বলার কোন সুযোগ পেলাম না। কারণ যে প্রশ্ন তিনি করছিলেন তার জবাব তো আমাকেই কেবল দিতে হবে। তাই মিথ্যা আর বলতে পারলাম না। যার দরুন আমি যে জবাব দিতেছিলাম সবগুলিই হুযূর আকরাম (সা.)র পক্ষে গিয়েছিল। বস্তুত, জাহেলিয়্যাত যুগের লোক যারা তখনও ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়নি তারাও মিথ্যা কথা বলতে পছন্দ করতো না। কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করার পর মানুষ কিভাবে মিথ্যা কথা বলতে পারে?

মিথ্যা মেডিক্যাল সার্টিফিকেট

পরিতাপের বিষয় হচ্ছে যে, চলমান পরিস্থিতিতে এ ধরনের মিথ্যায় সাধারণত সকলেই লিপ্ত। এমনকি যে সকল মানুষ হালাল-হারাম জায়েয-নাজায়েয এবং শরীয়তের উপর চলতে গুরুত্বারোপ করে থাকেন তাদের মধ্যেও এ কাজটি পরিলক্ষিত হয়। তারাও মিথ্যা জাতীয় অনেক কিছুকেই মিথ্যার উর্ধ্বে বলেই মনে করে থাকেন। তাদের নিকট ইহা মিথ্যা বলেই যেন মনে হচ্ছে না। অথচ মিথ্যা বলে যাচ্ছে। মিথ্যা বর্ণনা করছে। এর মধ্যে রয়েছে দুটি অপরাধ। একটি হলো মিথ্যা বলার অপরাধ, দ্বিতীয়টি হলো, মিথ্যাকে মিথ্যা মনে না করার অপরাধ। উদাহরণস্বরূপ, একজন সৎ ব্যক্তি ছিলেন যিনি নামায-রোযা পালন করতেন, যিকির ও ওয়াজীফা আদায়ে সদা নিমগ্ন থাকতেন, বুযুর্গদের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করতেন। তিনি পাকিস্তানের বাইরে বসবাস করতেন। একদা তিনি পাকিস্তানে আসলেন, আমার সাথেও সাক্ষাৎ করার জন্যে আসলেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম আপনি কবে প্রত্যাবর্তন করবেন ? তিনি জবাব দিলেন, আমি আরোও আট-দশ দিন অবস্থান করব। আমার ছুটি শেষ হয়ে গিয়েছে। তবে আমি গতকাল বর্ধিত ছুটির জন্যে একটি মেডিক্যাল সার্টিফিকেট পাঠিয়েছি।

দ্বীন কি শুধু নামায-রোজার নাম ?

তিনি এমন আঙ্গিকেই মেডিক্যাল সার্টিফিকেট প্রেরণের কথা বললেন, মনে হলো এটা খুব সাধারণ বিষয়। এতে কোন প্রকারের অস্থিরতা নেই। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, মেডিক্যাল সার্টিফিকেট কেন নিলেন? তিনি জবাব দিলেন বর্ধিত ছুটির জন্যে। যদি মেডিক্যাল সার্টিফিকেট প্রেরণ না করি তাহলে ছুটি পাওয়া যাবে না। ঐ সার্টিফিকেটের মাধ্যমে ছুটি পাওয়া যাবে। অতঃপর আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে, আপনার ঐ মেডিক্যাল সার্টিফিকেটের মাঝে কি লিখা ছিলো? তিনি জবাবে বললেন এতে লিখা ছিলো, অসুস্থতা এতই প্রকট যার ফলে সফর করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। আমি বললাম যে, দ্বীন কি শুধু নামায-রোযার নাম? যিকিরে লিপ্ত থাকার নাম? বুযুর্গদের সাথে রয়েছে আপনার সুসম্পর্ক। তারপরও এ মেডিক্যাল সার্টিফিকেট কিভাবে যাচ্ছে? যেহেতু ব্যক্তিটি ছিলেন সৎলোক তাই তিনি পরিস্কারভাবে বলেছিলেন যে, আমি আজই প্রথম আপনার মুখ থেকে একথা শুনতে পেলাম, ইহাও একটি গর্হিত কাজ। আমি তাকে বললাম মিথ্যা আর কাকে বলা হয়? তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন তাহলে আর এমন কোন পন্থা আছে কি যার দ্বারা ছুটি বাড়াতে পারি। আমি তাকে বললাম যতটুকু ছুটি প্রাপ্য তাই গ্রহণ করুন। আর অতিরিক্ত ছুটির প্রয়োজন হলে অবৈতনিক ছুটি গ্রহণ করুন। কিন্তু ঐ মিথ্যা সার্টিফিকেট পাঠানো কিছুতেই বৈধ হবে না।

বর্তমান বিশ্বে মানুষদের ধারণা যে, মিথ্যা মেডিকেল সার্টিফিকেট বানানো তা মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত নয়। যিকির ও ওয়াজিফাকেই ধর্ম নামকরণ করে নিয়েছে। তাছাড়া জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে মিথ্যা-ব্যাপৃত হচ্ছে এর প্রতি কোন প্রকার উৎকণ্ঠাই নেই।

মিথ্যা সুপারিশ

একজন বিশিষ্ট সৎ শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান বুযুর্গ ব্যক্তির সুপারিশনামা একটি পত্র আসল। সে সময়ে আমি জেদ্দায় ছিলাম। পত্রে লিখা ছিল যে, আপনার নিকট যে ব্যক্তি উপস্থিত হচ্ছে তিনি হলেন ইন্ডিয়ার একজন অধিবাসী। তিনি পাকিস্তান যেতে চাচ্ছেন। তাই আপনি পাকিস্তানি

দূতাবাসে পাকিস্তানি নাগরিক হিসেবে একটি পাকিস্তানি পাসপোর্ট প্রদান করার জন্যে সুপারিশ করুন। তার পাসপোর্ট সৌদি আরবে হারিয়ে গিয়েছে। নিজেও পাকিস্তানি দূতাবাসে দরখাস্ত জমা দিয়েছেন এই বলে যে তার পাসপোর্ট হারিয়ে গিয়েছে। সুতরাং আপনি তার জন্য সুপারিশ করুন। এখন আপনারাই বলুন, একদিকে উমরা হচ্ছে, হজ্বও পালন হচ্ছে, তওয়াফ এবং সায়ীও হচ্ছে। এরই সাথে সাথে মিথ্যা ও প্রতারণাও হচ্ছে। মনে হয় যে, এটা ধর্মের কোন অংশই নয়। দ্বীনের সাথে তার কোন সম্পর্কই নেই। মানুষ হয়তো ধারণা করছে যে যখন পূর্ণ ইচ্ছার সাথে জেনে বুঝে মিথ্যা ব্যক্ত করা হয় তখনই তা মিথ্যা হবে। কিন্তু ডাক্তার দ্বারা মিথ্যা সার্টিফিকেট বানিয়ে নেওয়া, মিথ্যা সুপারিশ লিখে নেয়া অথবা মিথ্যা মুকাদ্দামা পেশ করা এগুলো কোন মিথ্যা নয়। অথচ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ "অর্থাৎ, যে কথাই সে মুখ থেকে বের করে, তাই গ্রহণ করার জন্য তার কাছে সদা প্রস্তুত প্রহরী রয়েছে।" (সূরা ক্বাফ আয়াত : ১৮)

শিশুদের সাথেও মিথ্যা বলা উচিৎ নয়

একদা হুযূর (সা.)–এর সম্মুখে একজন মহিলা একটি শিশুকে ডেকে কোলে নিতে চাচ্ছিল। কিন্তু শিশুটি তার নিকট আসতে চাচ্ছিলনা। তখন মহিলা শিশুটিকে প্রলোভন দিয়ে বলল যে, হে বাছা! আমার নিকট এসো, আমি তোমাকে একটা জিনিস দেব। হুযূর আকরাম (সা.) তার কথা শুনলেন এবং তিনি মহিলাকে জিজ্ঞেস করলেন তুমি কি তাকে কোন জিনিস দিতে ইচ্ছে করছ, নাকি তাকে কোলে নেয়ার জন্যে একথা বলেছ? ঐ মহিলা প্রত্যুত্তরে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! আমি তাকে খেজুর দিতে ইচ্ছে করেছি। যখন সে আমার নিকট আসবে আমি তাকে খেজুর দেব। হুজুর (সা.) ইরশাদ করলেন, তোমার যদি খেজুর দেয়ার ইচ্ছা না হতো বরং শুধু প্রলোভন দেয়ার জন্যে বলতে তাহলে তোমার আমল নামায় একটি মিথ্যার অভিযোগ লেখা হতো।

(আবু দাউদ কিতাবুল ঈমান বাবু ফিত তাশদীদ ফিল কিজব হাদীস ঃ ৪৯৯১)।

এ হাদীসের দ্বারা এ শিক্ষাই দেয়া হচ্ছে যে, শিশু-কিশোরদের সাথেও মিথ্যা বলা এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ করা উচিৎ নয়। এরূপ করা হলে কচি বয়সেই তাদের অন্তর থেকে মিথ্যার প্রতি নিন্দা ও ঘৃণা দূর হয়ে যাবে।

কৌতুক করেও মিথ্যা বলবে না

আমরা সাধারণত কৌতুক ও আমোদ-প্রমোদের জন্য মুখ দ্বারা মিথ্যা কথা বলে থাকি। অথচ নবী করীম (সা.) আমোদ-প্রমোদের মাঝেও মিথ্যা কথা বলতে নিষেধ করেছেন। অধিকন্তু, এক হাদীসে হুযূর (সা.) ইরশাদ করেন যে, আফসোস ঐ ব্যক্তির প্রতি, অথবা কঠোর বাক্যে তার সঠিক তরজমা এ হতে পারে যে, ঐ ব্যক্তির জন্য কঠোর শাস্তি, যে শুধু মানুষকে হাসানোর জন্যে মিথ্যা কথা বলে।

(আবু দাউদ, কিতাবুল আদব, হাদীস নং ঃ ৪৯৯০)

হুযূর (সাঃ) এর কৌতুক

আনন্দময় কথা এবং কৌতুক হযূর (সা.) নিজেও করেছেন। কিন্তু এমন কৌতুক করেননি যার মাঝে সামান্যতম মিথ্যা রয়েছে। অথবা বাস্তবের উল্টো রয়েছে। তিনি কেমন কৌতুক করতেন, তা হাদীসের ভাষ্যে এসেছে যে, একদা এক বৃদ্ধা মহিলা রাসূলে কারীম (সা.)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন যে, হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! আপনি আমার জন্য দুআ করুন যাতে আল্লাহ তা'আলা আমাকে জান্নাতে পৌঁছিয়ে দেন। হুযূর (সা.) বললেন যে, কোন বৃদ্ধা মহিলা জান্নাতে যাবে না। এ কথা শুনে বৃদ্ধা মহলিা কাঁদতে লাগল এবং বলতে লাগল ইহা খুবই ভয়াবহ বিষয় যে বৃদ্ধা মহিলারা জান্নাতে যাবে না। পরক্ষণে হুযূর (সা.) স্পষ্টভাবে ফরমালেন এর রহস্য হচ্ছে এই যে, কোন মহিলা বৃদ্ধাবস্থায় বেহেস্তে প্রবেশ করবে না। বরং তারা যুবতী হয়ে জান্নাতে যাবে। সুতরাং হুযূর (সা.) এমন আনন্দ দায়ক কৌতুক করলেন যার মধ্যে একটি কথাও বাস্তব বিরোধী নয় এবং মিথ্যাও নয়। *(শামায়েলে তিরমিযী)*।

একটি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন কৌতুকের দৃষ্টান্ত

এক গ্রাম্য মানুষ হুযূর (সা.) এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আবেদন করল, হে আল্লাহর রাসূল (সা.) আমাকে একটি উটনী দান করুন। হুযূর (সা.) বললেন, তোমাকে আমি একটি উটনীর বাচ্চা দেব। সে বলল হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! আমি বাচ্চা দিয়ে কি করব? আমারতো আরোহণের প্রয়োজন হচ্ছে। রাসূল (সা.) বললেন যে, তোমাকে যে উটনী দেওয়া হবে সেটাতো অবশ্যই কোন উটনীর বাচ্চাই হবে। এরূপভাবে হুযূর (সা.) তার সাথে কৌতুক করলেন। এবং ইহা এমন কৌতুক যার মধ্যে বাস্তবতা পরিপন্থী ও ভ্রান্তও কিছু বলা হয়নি। কৌতুক করার ক্ষেত্রে লক্ষ রাখতে হবে যাতে জবানকে সাবধানতার সাথে ব্যবহার করা হয়। মুখ দিয়ে যেন কোন অসংগতিপূর্ণ কথা বের না হয়। আজকাল আমাদের মাঝে সত্য-মিথ্যা বহু ঘটনা জন্ম লাভ করছে। সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক গল্প হিসেবে আমরা এগুলোকে কৌতুক করে বলে থাকি। এসব কিছুই মিথ্যা বলে গণ্য হবে। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সকলকে এ সকল মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করুন। আমীন॥ (শামায়েলে তিরমিযী)

মিথ্যা চারিত্রিক সনদপত্র

আজকাল মিথ্যা সনদ দেয়া বা নেয়া ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়ে গিয়েছে। বিশিষ্ট ধার্মিক ও শিক্ষিত লোকেরাও ইহার মধ্যে লিপ্ত। নিজেরা মিথ্যা সার্টিফিকেট সংগ্রহ করছে। অথবা অন্যের জন্য মিথ্যা সনদপত্র দিতেছে। যেমন যখন কোন ব্যক্তির চারিত্রিক সনদপত্রের প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন সে কারও নিকট থেকে চারিত্রিক সনদপত্র সংগ্রহ করে এবং সনদপত্র প্রদানকারী ব্যক্তি সনদপত্রে লিখে দেয় যে, আমি তার ব্যাপারে পাঁচ বৎসর যাবৎ জানি, সে একজন সৎ ব্যক্তি। তার চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব অত্যন্ত ভাল। কারোও অন্তরে এ ধারণাটুকু হচ্ছে না যে, আমি একটি অবৈধ কাজ করে যাচ্ছি। বরঞ্চ তারা ধারণা করছে যে, আমরা ভাল কাজ করে যাচ্ছি। কারণ সে প্রয়োজনের সম্মুখীন ছিল। আমি তার প্রয়োজন পূর্ণ

করে দিলাম। তার কাজ করে দিলাম। এটি তো একটি ছওয়াবের কাজ। অথচ আপনি যদি তার চারিত্রিক জীবন সম্পর্কে অবগত না হন, তাহলে এ ধরনের চারিত্রিক সনদপত্র প্রদান করা আপনার জন্য জায়েয নয়। অতএব, এটা মনে করার কোন কারণ নেই যে, আমি একটি ছাওয়াবের কাজ করে যাচ্ছি। এমন কোন ব্যক্তি থেকে চারিত্রিক সনদপত্র অর্জন করা যে ব্যক্তি আপনার অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত নয় তাও নাজায়েয। এমন ক্ষেত্রে সনদপত্র দাতা এবং গ্রহীতা উভয়ই গুনাহগার হবে।

চরিত্র সম্পর্কে জানার পদ্ধতি দু'টি

হযরত উমর (রা.)-এর সাথে এক ব্যক্তি তৃতীয় আরেক ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বললেন, হযরত! ঐ ব্যক্তি তো খুব ভাল। হযরত উমর ফারুক (রা.) বললেন, তুমি যে বলছ অমুক ব্যক্তি অত্যন্ত ভাল ও কর্মকুশলী। তুমি কি করে বললে ? তোমার সাথে কি তার কোন সময় লেন-দেন হয়েছে? সে ব্যক্তি জবাবে বলল যে, তার সাথে আমার কোন লেন-দেন হয়নি। অতঃপর উমর (রা.) আবার জিজ্ঞেস করলেন, তার সাথে তুমি কি কোন সফর করেছ? সে উত্তরে বলল, না। আমি তার সাথে কখনো সফর করিনি। তখন হযরত উমর (রা.) বললেন যে, তুমি তাহলে কিভাবে বলতে পার যে, ঐ লোকটি সৎ চরিত্রবান এবং কর্মকুশলী? কারণ, চরিত্রবান এবং কর্মকুশলী তখনই অনুমান করা যায়, যখন মানুষ তার সাথে কোন লেন-দেন করে। মানুষের চরিত্র সম্পর্কে জ্ঞাত হবার দ্বিতীয় পন্থা হচ্ছে তার সাথে সফর করা। কারণ মানুষ সফরের মধ্যে উন্মুক্ত হয়ে আত্মপ্রকাশ করে থাকে। তার চরিত্র তার কর্মনৈপুণ্য, তার হাল-হকিকত, তার বীরত্ব, তার ধ্যান-ধারণাও এক কথায় সবকিছুই সফরের মধ্যে প্রকাশ পেয়ে থাকে।

সুতরাং তুমি যদি তার সাথে কোন প্রকারের লেন-দেন করতে অথবা তার সাথে সফর করতে তাহলে তোমার পক্ষে একথা বলা সঠিক হতো যে, এ লোকটি ভাল। কিন্তু তুমি যেহেতু তার সাথে কোন প্রকার লেনদেন করনি, তার সাথে সফরও করনি তাই এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে তুমি তার সম্পর্কে কিছুই জান না। তুমি যেহেতু জান না তাই নিরব থাক। তুমি তার

সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই বলবে না। সে ব্যক্তি সম্পর্কে কেউ তোমাকে জিজ্ঞেস করলে সে সম্পর্কে যা জান, তা বলে দাও। যেমন এভাবে বলে দেবে যে, ভাই! মসজিদে নামাজ পড়তেতো দেখিছি বাকী অন্য অবস্থা আমার জানা নেই।

সনদপত্র একটি সাক্ষ্য

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে إِلاَّ مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ যে সত্য সাক্ষী প্রদান করে এবং তারা বুঝে। (সূরা যুখরুফ : ৮৬)

উল্লেখ্য এই সার্টিফিকেট এবং এই সত্যায়িত সনদপত্র এবং এ ধরনের সত্যায়িত করা শরীয়তের দৃষ্টিতে একটি সাক্ষ্য। যে ব্যক্তি সে সনদপত্রে স্বাক্ষর প্রদান করবে সে প্রকৃতপক্ষে সাক্ষ্যই দিচ্ছে। আয়াতের আলোকে সাক্ষ্য প্রদান করা তখনই সঠিক হবে, যখন মানুষের সে বিষয়ে জানা থাকে এমন কি অত্যন্ত নিশ্চয়তার সাথে জ্ঞাত থাকে যে, সে বাস্তবিকেই এ ধরনের। তখন মানুষ সাক্ষ্য দিতে পারে। তাছাড়া মানুষ সাক্ষ্য দিতে পারেনা। বর্তমানে এমন হচ্ছে যে, সে ব্যক্তির ব্যাপারে কোন কিছু জানা নেই, তা সত্ত্বেও তার চারিত্রিক সনদপত্র প্রদান করা হচ্ছে। তাই ইহা মিথ্যা সাক্ষ্যের গুনাহ হবে এবং মিথ্যা সাক্ষ্য এতই জঘন্য, যাকে নবী করীম (সা.) শিরকের সমপর্যায়ের বলে বর্ণনা করেছেন।

মিথ্যা সাক্ষ্য শিরকের সমপর্যায়ের

হাদীস শরীফে আসছে যে, একদা হুযূর (সা.) হেলান দিয়ে বসে ছিলেন। সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি কি তোমাদেরকে বলে দিব যে বড় বড় পাপ কোন্‌গুলো? সাহবায়ে কেরাম আবেদন করলেন যে, হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! অনুগ্রহ করে বলুন। হুযূর (সা.) বললেন যে, বড় বড় পাপ হচ্ছে : (১) আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা (২) পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া। তখন পর্যন্ত তিনি হেলান দিয়েই বসাছিলেন। তারপর তিনি সোজা হয়ে বসে বললেন যে, (৩) মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া। এবং এ বাক্যটি তিন বার উচ্চারণ করলেন। (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বয়ানুল কাবায়ীর, হাদীস নং ১৪৩)। এখন আপনারা মিথ্যা সাক্ষ্যের ঘৃণ্যতার প্রতি লক্ষ করুন। এক দিকে তিনি (সা.) এটাকে শিরকের সাথে সম্পৃক্ত করে বলেছেন, অপর দিকে এ মন্তব্যটি এমন ভঙ্গিতে তিনবার উচ্চারণ করলেন যে, প্রথমে তিনি (সা.) হেলান দিয়ে বসাছিলেন, অতঃপর তার ব্যাখ্যা দেয়ার সময়ে সোজা হয়ে বসলেন। কুরআনে কারীমেও মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়াকে শিরকের সাথে সম্পৃক্ত করে বর্ণনা করা হয়েছে।

যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

فَاجْتَنِبُوْا الرِّجْسَ مِنَ الاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ

অর্থাৎ, তোমরা প্রতিমাদের অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থাক এবং মিথ্যা কথন থেকে দূরে থাক। (সূরা হজ্ব, আয়াত নং : ৩০) এ থেকে বোঝা যায় যে, মিথ্যা কথা বলা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া কত ভয়ানক বিষয়।

মিথ্যা সনদপত্র দানকারী গুনাহগার হবে

মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া মিথ্যা বলার চাইতেও বেশী ঘৃণিত ও ভীতিপ্রদ। কারণ এক্ষেত্রে কয়েকটি গুনাহর সমাবেশ ঘটে। প্রথমত, মিথ্যা বলার গুনাহ। দ্বিতীয়ত, অপর এক ব্যক্তিকে বিভ্রান্ত করার গুনাহ। আপনি মিথ্যা সনদপত্র প্রদান করে মিথ্যা সাক্ষ্য দান করলেন এবং এই সনদপত্র যখন অন্যের নিকট পৌছে, তখন ঐ ব্যক্তি মনে করে যে এ ব্যক্তি অত্যন্ত ভাল এবং ভাল মনে করে তার সাথে কোন লেন-দেন করে বসে। ফলে সে লেন-দেনের মধে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সে ক্ষতিগ্রস্ততার দায়-দায়িত্ব আপনার উপরও বর্তাবে। অথবা আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করলেন এবং সে সাক্ষ্যের ভিত্তিতেই রায় হয়ে গেল, সে রায়ে যে কারোই কোন প্রকারের ক্ষতি হবে, এ সবগুলি আপনার উপরই বর্তাবে। সুতরাং এ মিথ্যা সাক্ষ্যের গুনাহ সাধারণ গুনাহ নয়। অত্যন্ত বড় গুনাহ।

আদালতে মিথ্যা

বর্তমান সমাজে মিথ্যার বাজার এতই সরগরম হয়ে উঠেছে যে, কোন ব্যক্তি অন্য কোথাও মিথ্যা বলুক বা নাই বলুক আদালতে যেন মিথ্যা বলতেই হবে। কোন কোন লোককে এমন বলতেও শোনা যায় যে,

"میاں سچی سچی بات کہدو کوئ عدالت میں تھوڑی کھڑ یے ہو"

"আরে মিঞা সত্য সত্য কথাই যদি বলবে, তাহলে আদালতে কখনো দাঁড়াবে না।" অর্থাৎ আদালত হলো মিথ্যা বলার কেন্দ্র স্থল। সেখানে গিয়ে মিথ্যাই বলতে হয়। অথচ আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়াকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিরকের সমপর্যায়ের বলে ঘোষণা দিয়েছেন। তাই মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়ার মধ্যে সকল পাপের সমাবেশ ঘটে।

মাদরাসার জন্য সাক্ষ্য দেয়া

অজ্ঞতা সত্ত্বেও সনদপত্র সত্যায়িত হচ্ছে। সার্টিফিকেট প্রদান করা হচ্ছে এবং প্রদানকারী নিজেও জানে যে, আমি অসত্য সার্টিফিকেট প্রদান করছি। যেমন অসুস্থ হওয়ার সার্টিফিকেট প্রদান করল, অথবা কারো মিথ্যা আরয পূর্ণ করার দরখাস্ত সত্যায়িত করলো, কিংবা কাউকে না জেনে বা অতিরঞ্জিত করে চারিত্রিক সনদ প্রদান করলো; এসব কিছুই মিথ্যা সাক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত। আমার নিকট অনেকেই মাদ্রাসার সত্যায়িত করার জন্য আসে। এই বলে সত্যায়িত চায় যে, এ মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, এতে এ ধরনের শিক্ষা-দিক্ষা হচ্ছে। এ সত্যায়িত প্রদান করার উদ্দেশ্য হলো যাতে মানুষের আস্থা সৃষ্টি হয় যে, মাদ্রাসা ঠিকই পরিচালিত রয়েছে এবং সাহায্য পাওয়ার উপযুক্ত।

সম্প্রতি কালে এ সকল মাদ্রাসাগুলোকে সত্যায়িত করতে মনেও চায়। কিন্তু আমি আমার পিতা হযরত মাওঃ মুফতী মুহাম্মাদ শফী সাহেব (রহ.) কে দেখতে পেয়েছি যে, যখন কোন মাদ্রাসার সত্যায়িত করার জন্য তার নিকট কেউ আসত, তখন তিনি অপারগতা প্রকাশ করে বলতেন যে, হে ভাই! ইহা একটি সাক্ষ্য। এ মাদ্রাসা সম্পর্কে আমার যতক্ষণ পর্যন্ত অভিজ্ঞতা লাভ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তার সত্যায়িত করতে পারব না। কারণ ইহা একটি মিথ্যা সাক্ষ্য হয়ে যাবে। অবশ্য কোন মাদ্রাসা সম্বন্ধে যে পরিমাণ জানা থাকতো তা লিখে দিতেন।

পুস্তিকার অভিমত লেখা সাক্ষ্য

অনেক লোক পুস্তিকার উপর লিখানোর জন্যে আসে যে, আমি এ কিতাব বা পুস্তিকাটি লিখেছি, আপনি এর উপর অভিমত লিখে দিন যে, এ কিতাবটি ভাল এবং নির্ভুল। অথচ মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত তা পরিপূর্ণভাবে না পড়বে এবং পরিপূর্ণভাবে অধ্যয়ন করবে, সে কিভাবে সাক্ষ্য দেবে যে, এ কিতাবটি সঠিক ও নির্ভুল। অনেকে এ দৃষ্টিকোণ থেকে অভিমত লিখে দেয় যে, এ অভিমতের দ্বারা তার উপকার ও মঙ্গল হবে। পক্ষান্তরে অভিমত লেখাও হচ্ছে একটি সাক্ষ্য। এ ধরনের সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে সংঘটিত ভুলকে মানুষ ভুলের আওতা বহির্ভূত বলে মনে করে।

আবার লোকেরা বলে থাকে যে, জনাব আমি একটি সামান্য কাজ নিয়ে তার নিকটে গিয়েছিলাম তিনি যদি সামান্যতম কলমটি ধরে একটি সনদ লিখে দিতেন, তাহলে তার কিসের ক্ষতিটা হতো? তিনিতো অত্যন্ত নিন্দনীয় ব্যক্তি। কাউকে একটি সার্টিফিকেট প্রদান করেন না। জনাব প্রকৃত কথা হচ্ছে যে, প্রতিটি শব্দের জন্যেই আল্লাহ তা'আলার নিকট জিজ্ঞাসিত হতে হবে। মুখ দ্বারা যে শব্দ বের হচ্ছে, কলম দ্বারা যে শব্দ লিখা হচ্ছে, সবকিছুই আল্লাহ তা'আলার নিকট সংরক্ষিত হচ্ছে, এগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে, অমুক শব্দটি তুমি মুখ দিয়ে বের করেছিলে তা কিসের ভিত্তিতে বের করে ছিলে, জেনে বুঝেই বলেছিলে না ভুল বশত বলেছিলে।

মিথ্যা থেকে বাঁচুন

ভাই সকল! আমাদের সামাজিক জীবনে মিথ্যার যে ভয়াল স্রোত বিস্তার করে আছে তার মধ্যে ভাল, অভিজাত, ধার্মিক, শিক্ষিত, নামাযী, বুযুর্গদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনকারী, ওয়াযীফা এবং তাসবিহসমূহ যথারীতি আদায়কারী ব্যক্তিগণও রয়েছেন। তাঁরাও এসব মিথ্যাকে নাজায়েজ এবং গর্হিত কাজ বলে মনে করেন না। তারা মনে করল না যে, সনদপত্র প্রদান করা হলে গুনাহ হবে। অথচ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এরশাদ, إذَا حَدَّثَ كَذَبَ সে যখন কথা বলে তখন মিথ্যা বলে। বরং তারা মনে করে উক্ত ধরনের মিথ্যা এ হাদীসের অন্তর্ভুক্ত নয়। এসব কিছু দ্বীনের অংশবিশেষ। প্রকৃতপক্ষে এগুলোকে দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত মনে করা নিতান্তই ভ্রষ্টতা। এগুলো থেকে বেঁচে থাকা অপরিহার্য।

মিথা বলার অনুমতি

অবশ্য এমনও কতিপয় অবস্থা রয়েছে, যেখানে আল্লাহ তা'আলা মিথ্যা বলার অনুমতি দিয়েছেন। যেমন যেখানে মানুষ নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্যে মিথ্যা বলতে বাধ্য হয় এবং প্রাণ বাঁচানোর জন্য অন্য কোন উপায় থাকে না। অথবা অসহনীয় জুলুম-নির্যাতন ভোগ করার আশংকা হয়। যদি

মিথ্যা না বলে, তাহলে সে এমন নির্যাতনের শিকার হবে যা হবে ধৈর্যের উর্ধ্বে। এমন পরিস্থিতিতে শরীয়তে মিথ্যা বলার অনুমতি রয়েছে। অবশ্য এ ক্ষেত্রেও শরীয়তের বিধান রয়েছে যে, সর্বপ্রথম চেষ্টা করতে হবে যাতে সরাসরি মিথ্যা না বলতে হয়, সে জন্য একেবারে প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে। বরং এমন হযবরল বাক্য বলে দিতে হবে যদ্দ্বারা সাময়িক বিপদ দূর হয়ে যাবে। যাকে শরীয়তের পরিভাষায় تعريض ও توريه (তা'রীজ ও তাওরীয়া) তথা পাশ কাটিয়ে যাওয়া বলা হয়। অর্থাৎ, এমন কোন বাক্য বলে দেয়া যার প্রকাশ্য অর্থ একটি হবে এবং প্রকৃতপক্ষে অন্তরে তার অন্য একটি উদ্দেশ্য নিহিত থাকবে। এমন হযবরল বাক্য বলে দেওয়া যাতে প্রকাশ্যভাবে মিথ্যা না বলতে হয়।

হযরত সিদ্দীক (রাঃ) এর মিথ্যা পরিহার

হিজরতের সময় যখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) হুযূরে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মদীনার দিকে যাইতে ছিলেন। তখন মক্কার লোকেরা হুযূর (সা.) কে ধরার জন্য চারদিকে ছুটাছুটি করছিলো এবং এ ঘোষণা করছিল যে, যে ব্যক্তি হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ধরে দিবে তাঁকে একশত উট পুরস্কার দেয়া হবে। তখন মক্কার সকল লোকেরাই হুযূর (সা.) এর অনুসন্ধানের জন্য দোঁড়াদৌড়ি করছিল। পথিমধ্যে হযরত আবু বকরের (রা.) পরিচিত এক লোকের সাথে সাক্ষাৎ হয়। ঐ ব্যক্তি হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)কে চিনতো কিন্তু হুযূরে আকরাম (সা.) কে চিনতো না। সে ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো যে, তোমার সাথে এ ব্যক্তি কে? তখন আবু বকর (রা.) সতর্ক থাকলেন যাতে হুযূর (সা.) এর সম্পর্কে কারো কোন তথ্য উৎঘাটিত না হয়। যাতে করে শত্রুদের নিকট তাঁর সম্পর্কে কোন তথ্য না পৌছে। আর জবাবে যদি সঠিক কথা বলে দেন, তাহলে হুযূর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রাণনাশের আশঙ্কা রয়েছে। আর যদি সঠিক জবাব না দেন তাহলে মিথ্যা বলতে হচ্ছে নির্ঘাত। এমন পরিস্থিতিতে আল্লাহ তা'আলাই নিজ বান্দাদেরকে পথ প্রদর্শন করেন। সুতরাং সিদ্দীকে আকরাম (রা.) জবাব দিবেন هَذَا الرَّجُلُ يَهْدِنِى السَّبِيْلَ অর্থাৎ তিনি আমার পথ

প্রদর্শক। যিনি আমাকে পথ প্রদর্শন করেন। এ ক্ষেত্রে তিনি এমন একটি হযবরল বাক্য বলে দিলেন, যা শুনে ঐ ব্যক্তির মনে এ ধারণা হলো যে, সাধারণত সফরের সময় যেমন পথ প্রদর্শনের জন্য কাউকে সাথে রাখা হয় অনুরূপই একজন পথ প্রদর্শক সঙ্গে যাচ্ছে। কিন্তু হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এর মনে এ ভাবার্থ নেন যে, তিনি হলেন দ্বীনের পথ প্রদর্শক। বেহেশতের পথের দিশারী। আল্লাহর রাহে সন্ধান দানকারী। এ ক্ষেত্রে দেখুন যে, এ পরিস্থিতিতে তিনি প্রকাশ্যভাবে মিথ্যা বলা থেবে বেঁচে থাকলেন এবং তিনি এমন একটি ভাষা প্রয়োগ করলেন যার দ্বারা উপস্থিত সমস্যা সমাধান হয়ে গেল। মিথ্যাও বলতে হলো না। (সহীহ বুখারী, কিতাব মানাকিবুল আনসার, হিজরতে নবী অনুচ্ছেদ, হাদিস নং ৩৯১১) যে সকল মানুষের অন্তরে আল্লাহ তা'আলা এ ধ্যান-ধারণা দান করে থাকেন যে মুখ দিয়ে অবাস্তব এবং মিথ্যা কোন কথা বের করবো না, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সাহায্য করে থাকেন।

হযরত গাংগুহী (রহঃ) ও মিথ্যা বর্জন

হযরত মাওঃ রশীদ আহমাদ গাংগুহী (রহঃ) যিনি ১৮৫৭ ইংরেজীর স্বাধীনতা আন্দোলনে ইংরেজবিরোধী আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি ব্যতীত হযরত মাওঃ কাসেম নানুতুভী (রহঃ), হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজীরে মক্কী প্রমুখ সে আন্দোলনে জিহাদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। যে সকল মানুষ সে জিহাদে অংশগ্রহণ করেছিলেন ইংরেজরা তাঁদেরকে ধর-পাকর আরম্ভ করলো এবং চৌরাস্তাগুলিতে ফাঁসীর কাষ্ঠ ঝুলিয়ে দিলো। প্রত্যেক এলাকাতেই ম্যাজিস্ট্রেটগণের ভ্রাম্যমান আদালত প্রতিষ্ঠিত করা হলো। যেখানে কোন ব্যক্তির প্রতি সন্দেহ হতো তাৎক্ষণিকভাবে তাকে ম্যাজিস্ট্রেট এর আদালতে উপস্থিত করা হতো এবং ম্যাজিস্ট্রেট হুকুম জারী করে দিত যে তাকে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিয়ে দাও তখনই ঝুলিয়ে দেয়া হতো।

মিরাটে হযরত গাংগুহী (রহঃ)-এর বিরুদ্ধে এক মামলা দায়ের করা হলো। যখন ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে তিনি উপস্থিত হন, তখন ম্যাজিস্ট্রেট জিজ্ঞেস করলেন যে, আপনার নিকট কি কোন অস্ত্র আছে? এর কারণ হলো

যে, ম্যাজিস্ট্রেট জানতে পেরেছিল তাঁর নিকট বন্দুক রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে হযরতের নিকট বন্দুক ছিলও বটে। যখন ম্যাজিস্ট্রেট জিজ্ঞেস করল, তখন হযরতের হাতে ছিল তাসবীহ। তিনি তাসবীহ দেখিয়ে বললেন যে, আমাদের অস্ত্র হচ্ছে এটি। তিনি এ কথা বলেননি যে, আমার নিকট অস্ত্র নেই। কারণ তাহলে একথা মিথ্যা হয়ে যেত। আর বাহ্যিক অবস্থাও এমন ছিল যে মনে হতো তিনি একজন দরবেশ। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে সাহায্য করে থাকেন। তখনও জেরা চলছিল ইতিমধ্যেই কোন একজন গ্রাম্য ব্যক্তি আসল। যখন সে দেখতে পেল যে, হযরতের সাথে এ ধরনের জিজ্ঞাসাবাদ চলতেছে, অমনি সে বলল, হায়! এ লোককে কোত্থেকে নিয়ে আসা হলো, তিনি তো আমাদের এলাকার মু'য়াজ্জিন। এমনিভাবে আল্লাহ তাআলা তাঁকে মুক্তি দিলেন।

হযরত নানুতুভী (রহঃ) ও মিথ্যা বর্জন

হযরত মাওঃ কাসেম নানুতুভী (রহ.) এর বিরুদ্ধে গ্রেফ্তারী ফরমান জারী করা হলো। চতুর্দিকে পুলিশ তল্লাশী চালিয়ে ঘোরাফেরা করছে। তিনি তখন মসজিদে ছিলেন। সেখানেও পুলিশ পৌঁছে যায়। মসজিদে তিনি একাই ছিলেন। হযরত মাওঃ কাসেম নানুতুভীর নাম শুনলেই একটা ধারণা জন্মে যে, তিনি হলেন একজন বিজ্ঞ আলেম, তিনি অবশ্যই আড়ম্বর পোশাক এবং জুব্বা পরিহিত হবেন। সেখানে তো কিছুই ছিলনা। তিনি তো একটি সাধারণ লুঙ্গি ও সাধারণ জামা পরিহিত ছিলেন। পুলিশরা এমন লোককে মসজিদে দেখে ধারণা করলো যে, তিনি হয়তো মসজিদের খাদেম হবেন।

সুতরাং পুলিশরা জিজ্ঞেস করল যে, মাওঃ কাসেম সাহেব কোথায়? তিনি তাৎক্ষণিকভাবে নিজের স্থান থেকে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং সামান্য সরে গিয়ে বললেন যে, কিছুক্ষণ পূর্বে এখানেই তো ছিল। তিনি মুখ দিয়ে মিথ্যা কথা বের করেননি যে এখানে নেই। কৌশলে পুলিশের হাত থেকে

নিজেকে হেফাজত করলেন। পুলিশরা চলে গেল। আল্লাহর বান্দাগণের নাকের ডগায় যখন জান থাকে তখনও সে সতর্ক থাকে যাতে করে কোন মিথ্যা বাক্য মুখ দিয়ে বের না হয়। যদি কোন সময় কোন বিপদের সম্মুখীন হন তখনও হযবরল, ও গুলমালভাবে কথা বলে সমস্যা থেকে উৎড়িয়ে যান, ইহাই হচ্ছে উত্তম পন্থা। অবশ্য যদি প্রাণনাশের আশঙ্কা হয়, অথবা অমানুষিক ও অসহনীয় অত্যাচার ও নির্যাতনের শিকার হবার আশঙ্কা থাকে প্রকটভাবে, এবং ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে ও হযবরল কথা বলার সুযোগ না থাকে, সে পরিস্থিতিতে মিথ্যা বলার অনুমতি রয়েছে। কিন্তু এ অনুমতিটুকুকে ব্যাপক হারে কাজে লাগানো– যেমন না কি বর্তমান সমাজে প্রচলিত হয়ে গেছে, হারাম এবং এর মধ্যে রয়েছে মিথ্যা সাক্ষ্যের গুনাহ। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এগুলি থেকে হেফাযত করুন।

শিশুদের অন্তরে মিথ্যার প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করুন

শিশুদর অন্তরে মিথ্যার প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করা উচিৎ। নিজেও সর্ব প্রথম মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকার অভ্যাস করতে হবে। শিশুদের সাথেও এভাবে কথা বলতে হবে, যেন তার অন্তরেও মিথ্যার প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হয় এবং সততার প্রতি আন্তরিকতা সৃষ্টি হয়। সুতরাং শিশুদের সম্মুখে কোন প্রকারের গলদ কথা অথবা কোন প্রকারের মিথ্যা বলতে নেই। এর কারণ হচ্ছে যে, শিশুরা যখন মা-বাবাকে মিথ্যা বলতে দেখতে পায়, তখন শিশুদের অন্তর থেকে মিথ্যা বলার প্রতি ঘৃণা বিদূরিত হয়ে যায় এবং তারা বুঝে নেয় যে, এ ধরনের মিথ্যা বলা তো প্রতিদিনের সাধারণ কাজ। অধিকন্তু, শিশুকাল থেকেই শিশু-কিশোরদেরকে এ অভ্যাসে গড়তে হবে যাতে মুখ দিয়ে যা বের হয়, তা পাথেয় হয়, তাতে কোন প্রকারের ভুল এবং অবাস্তব কোন কাজ যেন না হয়। লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, নবুওয়াতের পর সর্বাপেক্ষা উচ্চস্তরের সোপান বা স্থান হলো صِدِّيْقٌ বা সত্যবাদিতার স্তর। صِدِّيْقٌ সিদ্দীক এর অর্থ হলো সর্বাপেক্ষা সত্যবাদী। যার কথার মাঝে বাস্তবের বিপরীত কোন কথা বা কাজের সন্দেহের অবকাশটুকুও হবে না।

কাজের দ্বারাও মিথ্যা হয়ে থাকে

মুখের কথার ন্যায় কোন কোন সময় কাজ দ্বারাও মিথ্যা প্রকাশ পেয়ে থাকে। কোন সময় মানুষ এমন কাজ করে থাকে যা প্রকৃতপক্ষে মিথ্যা হয়ে থাকে। হাদিস শরীফে নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন যে, اَلْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُوْرٍ (আবু দাউদ, কিতাবুল আদব, হাদীস নং ঃ ৪৯৯৭) অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি নিজের কৃত কাজ দ্বারা নিজকে নিজে এমন কাজের ধারক বলে প্রকাশ করে, যা তার মধ্যে নেই। তাহলে সে হলো মিথ্যার পোশাক পরিধানকারী।" উক্ত হাদীসের মর্ম হচ্ছে যে, কোন ব্যক্তি নিজকে এমনভাবে প্রকাশ করে যা বাস্তবে তার মধ্যে নেই। ইহাও গুনাহ। যেমন কোন ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে সম্পদশালী নয়। কিন্তু তার চলা-ফেরা এবং উঠা-বসার দ্বারা নিজেকে সম্পদশালী বলে প্রকাশ করে। ইহা হচ্ছে কর্মের দ্বারা কৃত মিথ্যা। অথবা তার বিপরীত অর্থাৎ কোন সম্পদশালী ব্যক্তি লৌকিকতা করে এমনভাবে চলা-ফেরা করে, যাতে মানুষ বুঝতে পায় যে তার নিকট কিছুই নেই। সে একজন দরিদ্র ব্যক্তি। অথচ বাস্তবে সে দরিদ্র নয়। এমন কাজকেও নবী কারীম (সা.) কর্মের দ্বারা কৃত মিথ্যা বলে আখ্যা দিয়েছেন। সুতরাং কাজ করার মধ্যে এমন প্রকাশ ঘটানো যার দ্বারা অন্য ব্যক্তির উপর অবাস্তব প্রভাব পড়ে, তাহলে মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত হবে।

নিজের নামের পূর্বে সাইয়্যিদ লেখা

অনেক মানুষই নিজের নামের সাথে এমন এমন উপাধি লিখে থাকে যা বাস্তবতার সাথে মিল নেই। যেহেতু প্রথাটি চলে আসছে তজ্জন্য কোন প্রকার তথ্যানুসন্ধান ছাড়াই তা লিখতে শুরু করেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কোন ব্যক্তি নিজের নামের সাথে সাইয়্যিদ সংযুক্ত করে লিখতে থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে সাইয়্যিদ নয়। সাইয়্যিদ তো সে ব্যক্তিই হবেন যিনি পিতার বংশের দিক দিয়ে নবী করীম (সা.) এর বংশধর থেকে হবেন। কোন কোন ব্যক্তি মায়ের পক্ষ থেকে নবী করীম (সা.) এর বংশীয় হয়ে থাকেন, ফলে নিজেকে সাইয়্যিদ বলে লিখতে আরম্ভ করে। তাও ঠিক নয়। অতএব যতক্ষণ না পর্যন্ত সাইয়্যিদ হওয়া সংক্রান্ত বিষয়ে সঠিক তথ্য উদ্‌ঘাটিত

হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সাইয়্যিদ লিখা বৈধ হবে না। অবশ্য তথ্যানুসন্ধানের ক্ষেত্রে এতটুকুই যথেষ্ট যে, যদি প্রথাগতভাবে বংশানুক্রমিক সাইয়্যিদ বংশীয় খ্যাতি লাভ করে থাকে তাহলে সাইয়্যিদ লিখতে কোন প্রকারের দোষই নেই। তবে যদি সাইয়্যিদ হওয়া সম্পর্কে অজ্ঞাত থাকে এবং এ সম্পর্কে কোন প্রকারের প্রমাণাদি না থাকে তাহলে এর মধ্যে মিথ্যা বলার গুনাহ হবে।

প্রফেসর ও মাওলানা শব্দ লিখা

কতক লোক বাস্তবে প্রফেসর নয়, কিন্তু নিজ নামের সাথে প্রফেসর লিখে থাকে, কেননা প্রফেসর একটি বিশেষ পরিভাষা যা বিশেষ ব্যক্তিবর্গের বেলায় প্রয়োগ করা হয়। অনুরূপভাবে, "আলেম" অথবা "মাওলানা" শব্দটি তাদের বেলায়ই প্রযোজ্য হয়ে থাকে যারা নিয়মিতভাবে দরসে নেজামী পাঠ্যক্রণানুসারে সর্বোচ্চ শিক্ষা সমাপ্ত করে এবং নিয়মতান্ত্রিকভাবে এলেম শিক্ষা করে তাদের বেলায়ই মাওলানা শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থকে। বস্তুত, অনেক মানুষই যারা এলেম অর্জন করেনি অথচ নিজের নামের সাথে মাওলানা লিখেন তাও ডাহা মিথ্যা। কিন্তু এ সমস্ত কাজকে তারা মিথ্যা মনে করেনা এবং গুনাহও মনে করে না। এগুলি থেকে বেঁচে থাকা একান্ত অপরিহার্য। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে এসব থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করুন। আমীন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ওয়াদা ভঙ্গ ও তার বিভিন্ন রূপ

অঙ্গীকার ভঙ্গ করার এমন কতকগুলো দিক রয়েছে যেগুলোকে আমরা অঙ্গীকার ভঙ্গের তালিকা থেকে বাদ দিয়েছি। সুতরাং যদি কাউকে জিজ্ঞেস করা হয় অঙ্গীকার ভঙ্গ করা কি ভাল কাজ? তাহলে উত্তরে বলবে নিশ্চয়ই ইহা অত্যন্ত ঘৃণিত বিষয় এবং জঘন্য স্তরের গুনাহ। কিন্তু তারাই কর্মজীবনে সুযোগ বুঝে অঙ্গীকার ভঙ্গ করে থাকে। আর নিজেরা অঙ্গীকার ভঙ্গ করছে, এরূপ খেয়ালও তাদের মধ্যে হয় না।

শক্তি থাকা পর্যন্ত অঙ্গীকার পূর্ণ করতে হবে

মুনাফিকের দ্বিতীয় চিহ্ন যা নবী করীম (সা.) এরশাদ করেছেন আর তা হচ্ছে এই যে, إِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ যখন সে অঙ্গীকার করে তখন তা ভঙ্গ করে।

মুমিন ব্যক্তির কাজতো এই হবে যে যখন সে অঙ্গীকার করবে তখন তা পূর্ণ করবে। শরীয়তের নিয়ম এই যে, যদি কোন ব্যক্তি কোন অঙ্গীকার করে এবং পরবর্তীতে কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনের সম্মুখীন হয়ে যায় অথবা কোন বাধার সম্মুখীন হতে হয় যার দরুণ অঙ্গীকার পূর্ণ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়, এমতাবস্থায় অঙ্গীকারকারী ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বলে দিবে যে, আমার পক্ষে এ অঙ্গীকারকে পূর্ণ করা সম্ভব হচ্ছে না। যেমন, কোন এক ব্যক্তি অঙ্গীকার করলো যে, আমি তোমাকে অমুক তারিখে এক হজার টাকা দেব। তারপর অঙ্গীকারকারীর নিকট টাকা শেষ হয়ে যায়। এ প্রেক্ষিতে তাকে সাহায্য করতে পারে এমন সামর্থ্য তার নেই এবং এক হাজার টাকা দেয়ার সামর্থ্য তার নেই। এমতাবস্থায় বলে দেবে যে, আমি এক হাজার টাকা দিতে আপনার সাথে অঙ্গীকার করে ছিলাম। কিন্তু এ মুহূর্তে সে অঙ্গীকার পূর্ণ করার সামর্থ্য আমার নেই।

বস্তুত যতক্ষণ অঙ্গীকার পূর্ণ করার শক্তি থাকে এবং শরয়ী কোন বাধা না থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করতে হবে।

কথা দেয়াও একটি অঙ্গীকার

দৃষ্টান্তস্বরূপ, কোন ব্যক্তি কথা দান করেছে অথবা কারও সাথে আত্মীয়তা করার কথা পাকা করেছে তাহলে এ ধরনের কথা দানও একটি অঙ্গীকার। এ জন্যেই যথাসাধ্য তা পূর্ণ করা উচিত। তবে কোন প্রকারের অভিযোগের সম্মুখীন হলে, যেমন কথা দান করার পর উপলব্ধি করতে পারল যে, তাদের দুজনের মাঝে একতা এবং সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত থাকবে না। অভ্যাস এবং মানসিকতার মাঝে উভয়ের রয়েছে পার্থক্য এবং এমন কিছু অবস্থার বিকাশ ঘটে যা পূর্বে জানা ছিল না। এমতাবস্থায় তাকে বলে দিতে হবে যে আমি আপনার সাথে বিবাহের অঙ্গীকার এবং জবান দিয়েছিলাম। কিন্তু এখন আমার অমুক ওজর হেতু আমি তা পূর্ণ করতে সক্ষম নই। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত কোন প্রকারের উজরের সম্মুখীন না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত অঙ্গীকার পূর্ণ করা শরীয়তের দৃষ্টিকোণে ওয়াজীব। যদি অঙ্গীকার পূর্ণ না করা হয়, তাহলে সে হাদীসের ভাষ্যানুসারে গুনাহগার হবে।

আবু জাহ্‌লের সাথে হযরত হুজাইফা (রাঃ) এর অঙ্গীকার

হুযূর আকরাম (সা.) এমন এমন অঙ্গীকার পূর্ণ করেছেন যে, আল্লাহর শপথ! বর্তমান বিশ্বে তার কোন দৃষ্টান্ত পেশ করা যায় না। হযরত হুজাইফা বিন ইয়ামান (রা.) ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ সাহাবী ও হুজুর (সা.) এর বিশ্বস্ত ব্যক্তি। তিনি এবং তার পিতা হযরত ইয়ামান (রা.) মুসলমান হওয়ার পর হুযূর (সা.)-এর খিদমতে মদীনা তাইয়্যিবায় আসতে ছিলেন। পথিমধ্যে আবু জাহ্‌ল ও তদীয় সৈন্যদের সাথে তাদের সাক্ষাৎ হয়। ঐ সময় আবু জাহ্‌ল স্বীয় সৈন্যদেরকে নিয়ে হুযূরের (সা.) সাথে যুদ্ধ করার জন্য যাচ্ছিল। আবু জাহ্‌লের সাথে যখন হুজাইফা (রা.) এর সাক্ষাৎ হলো তখন আবু জাহ্‌ল তাদের গ্রেফতার করে ফেলল এবং জিজ্ঞেস করল যে, কোথায়

যাচ্ছ? তারা প্রতি উত্তরে বললেন যে, আমরা হুযূর (সা) এর খিদমতে মদীনা তাইয়্যিবায় যাচ্ছি। আবু জাহ্ল বলল এবার আমি তোমাদেরকে ছাড়ব না। কারণ তোমরা মদীনায় গিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নেবে। তারা বলল আমাদের উদ্দেশ্যতো হুজুর (সা.) এর সাথে সাক্ষাৎ করা এবং যিয়ারত করা। আমরা যুদ্ধে অংশ নেব না। আবু জাহ্ল বলল আচ্ছা আমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দাও যে, সেখান শুধু সাক্ষাৎই করবে, যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে না। তাঁরা প্রতিশ্রুতি দিলেন। সুতরাং আবু জাহ্ল তাঁদেরকে ছেড়ে দিলো। তাঁরা যখন হুযূর আকরাম (সা.)-এর নিকট পৌঁছলেন তখন হুযূর (সা.) বদর যুদ্ধের জন্য সাহাবায়ে কেরামের সাথে মদীনা মুনাওয়ারা থেকে রওয়ানা করে আসছিলেন এবং রাস্তায়ই হুযূর (সা.) এর সাথে তাদের সাক্ষাৎ হয়ে গেল।

সত্য ও অসত্যের মাঝে প্রথম যুদ্ধ "বদরের যুদ্ধ"

এখন অনুমান করুন যে, ইসলামের সর্ব প্রথম সত্য ও অসত্যের মাঝে যুদ্ধ (বদর যুদ্ধ) হচ্ছে এবং ইহা এমনই তাৎপর্যপূর্ণ যুদ্ধ যাকে কুরআনে يَوْمُ الْفُرْقَانِ অর্থাৎ সত্য ও অসত্যের মাঝে পার্থক্যকারী যুদ্ধ বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে। ইহা এমন একটি যুদ্ধ যাতে অংশগ্রহণকারীদেরকে বদরী উপাধিতে ভূষিত করা হয় এবং সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে বদরী সাহাবীদের মর্যাদা অনেক শীর্ষে। বদরী সাহাবায়ে কেরামের (রা.) নামসমূহকে ওয়াজিফা হিসেবে পাঠ করা হয়। তাঁদের নাম পাঠ করার দ্বারা আল্লাহ তাআলা দু'আ কবুল করে থাকেন। বদরী সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে নবী করীম (সা.) ভবিষ্যৎদ্বাণী করেছেন যে, যারা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে তাদের সকলকে আল্লাহ তাআলা পুরস্কৃত করেছেন। এমন একটি যুদ্ধ সংঘটিত হতে যাচ্ছে।

কাঁধের উপর তরবারি ও প্রতিশ্রুতি

হুযূর (সা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ হওয়ার পর হযরত হুজাইফা (রা.) হুযূর (সা.)কে বললেন যে, পথিমধ্যে আবু জাহ্ল আমাদেরকে এরূপভাবে আটকিয়ে ছিল। আর আমরা অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে এ অঙ্গীকার প্রদান করে

মুক্তিলাভ করেছি যে, আমরা যুদ্ধে অংশ নেব না। অতঃপর আবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হতে যাচ্ছে, আপনি নিজেও সেখানে যাচ্ছেন। আমাদের বড়ই ইচ্ছে হয় আমরাও তাতে অংশগ্রহণ করি। আর আবু জাহ্লতো আমাদের কাঁধের উপর তরবারি রেখে অঙ্গীকার নিয়েছিল, আমরা যাতে যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করি। আমরা যদি তার শর্ত অস্বীকার করতাম তাহলে সে আমাদের মুক্তি দিত না। এজন্যই আমরা অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছিলাম। এখন আপনি আমাদেরকে অনুমতি প্রদান করুন যাতে আমরা এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারি এবং ফযীলত ও সৌভাগ্য অর্জন করতে পারি। (আল ইসাবাহ, ১ঃ৩১৬)

তোমরাতো কথা দিয়ে এসেছ !

কিন্তু সরদারে দু'আলম (সা.) বললেন, না! তোমরা প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছ, কথা দিয়ে এসেছ এবং তোমাদেরকে এ শর্তে মুক্তি দেয়া হয়েছে যে, তোমরা মুহাম্মাদ (সা.) এর সাথে সাক্ষাৎ করবে, কিন্তু যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে না। এ জন্য আমি তোমাদেরকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার অনুমতি প্রদান করি না।

দুনিয়া এমন একটি স্থান যেখানে মানুষের পরীক্ষা হয় যে, তারা স্বীয় জবান ও কৃত অঙ্গীকারের প্রতি কতটুকু যত্নবান হয়। তিনি (সা.) আমাদের মতে, মানুষ হলে হাজারো ব্যাখ্যা প্রদান করতো। এরকম ব্যাখ্যা প্রদান করতো যে, আবু জাহ্লের সাথে যে অঙ্গীকার করা হয়েছিল, তা আন্তরিক অঙ্গীকার ছিল না। সে তো আমাদের থেকে জোরপূর্বক প্রতিশ্রুতি নিয়েছিল। আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন আমাদের মস্তিষ্কে কত যে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আসতো। অথবা এ ব্যাখ্যা করে নিতো যে ইহা ছিল অপারগাবস্থায়, সুতরাং হুজুর (সা.)-এর সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করা এবং কাফেরদের মুকাবিলা করা বাঞ্ছনীয়। যেহেতু সেখানে এক একটি মানুষের মূল্য রয়েছে অনেক। কারণ মুসলমানদের সেনা দলে ছিল মাত্র তিনশত তের জন ব্যক্তি। যাদের নিকট ছিল শুধু সত্তরটি উট। দুটি ঘোড়া ও আটটি তরবারি। কেউ লাঠি উঠিয়ে নিল, কেউ ডাণ্ডা আবার কেউ পাথর কুড়িয়ে নিল। এ ক্ষুদ্র কাফেলা শত্রুপক্ষের অস্ত্রে সজ্জিত এক হাজার সশস্ত্র বাহিনীর

সাথে যুদ্ধ করার জন্য যাচ্ছিল। কারণ এ সময়ে এক একজন যোদ্ধার মূল্য ছিল খুবই উঁচু স্তরের। তা সত্ত্বেও মুহাম্মদ (সা.) বললেন যে, যে কথা দেয়া হয়েছে, এবং যে অঙ্গীকার করা হয়েছে তা ভঙ্গ করা যাবে না।

জিহাদর উদ্দেশ্য হচ্ছে সত্যকে সমুন্নত করা

জিহাদ কোন রাজ্য দখল করার জন্য হয় না এবং জিহাদ কোন নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যেও হয় না। জিহাদ হচ্ছে সত্যকে সমুন্নত করার জন্য। কিন্তু সত্যকে ধুলিস্যাৎ করে কি জিহাদ করা যাবে? তা তো হতে পারে না। গুনাহের কাজে লিপ্ত থেকে কি আল্লাহ তা'আলার দ্বীনের কাজ করা যাবে? আজ আমাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে যাচ্ছে এবং সকল চেষ্টা নিষ্ফল হতে যাচ্ছে। এর কারণ হচ্ছে গুনাহের মধ্যে লিপ্ত থেকে আমরা ইসলামের প্রচার করে যাচ্ছি। পাপ-পঙ্কিলতায় লিপ্ত থেকে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করতে যাচ্ছি। আমাদের চিন্তা-চেতনামানসপটে সদাসর্বদাই হাজারো ব্যাখ্যা হয়ে থাকে। তাই কখনো আমাদের যুক্তি বলে এটাই সঠিক, এটা করে এ হুকুমের উপর আমল করে দেখিয়ে দাও, আবার কখনো আমাদের দেমাগ বলে কাজটি করে নেয়াই ন্যায়সঙ্গত হবে, তাই এ কাজটি করে যাও।

একেই বলে অঙ্গীকার পূরণ

সেখানে তো উদ্দেশ্য ছিল একটাই। আর তা হলো আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন করা। যুদ্ধে ধন-সম্পদ অর্জন করা উদ্দেশ্য ছিল না। বিজয় অর্জন করাও উদ্দেশ্য ছিল না। কিংবা বীরত্ব প্রমাণ করাও উদ্দেশ্য ছিল না। উদ্দেশ্য ছিল কেবল আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন করা। আর আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি হচ্ছে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করার মধ্যে। এ কারণেই হুযাইফা ও তার পিতা হযরত ইয়ামান (রা.) উভয়জনকে হুজুর (সা.) বদর যুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ ফযীলত থেকে বঞ্চিত রেখেছিলেন। কেননা তাঁরা উভয় যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার কথা দিয়ে এসেছিল। একেই বলে অঙ্গীকার পূরণ।

হযরত মু'আবীয়া (রাঃ) এর দৃষ্টান্ত

বর্তমান বিশ্বে এরূপ অঙ্গীকার পূরণের দৃষ্টান্ত অনুসন্ধান করা হলে কোথাও কি তা পাওয়া যাবে? তবে মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ (সা.) এর

সাহাবাদের মধ্যে এমন দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। তাঁরা এরূপ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। হযরত মু'আবীয়া (রা.) ঐ সকল সাহাবায়ে কেরামগণ হতেই একজন, যাঁদের ব্যাপারে কতক মানুষ নানা অলীক ও অমূলক কথা প্রচার করে থাকে। আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করুক। আমীন ॥ তাঁর একটি ঘটনা শুনুন।

বিজয় অর্জনের লক্ষ্যে যুদ্ধের কৌশল

হযরত মু'আবীয়া (রা.) যেহেতু সিরিয়ায় ছিলেন সে জন্যই রোম সাম্রাজ্যের সাথে তার সর্বদাই যুদ্ধ চলমান ছিল। তাদের সাথে প্রায়ই যুদ্ধ লেগে থাকত এবং রোম তৎকালে একটি বৃহৎ শক্তি বলে স্বীকৃত ছিল। বিশ্বের বিশাল শক্তির সমারোহ ছিল তার। একদা হযরত মুআবীয়া (রা.) রোমের সাথে যুদ্ধ বিরতির অঙ্গীকারে আবদ্ধ হলেন এবং একটি তারিখ নির্ধারণ করলেন যে, এ তারিখ পর্যন্ত আমরা পরস্পরে যুদ্ধ করবনা। তখনও যুদ্ধ বিরতির অঙ্গীকারের সময় সীমা শেষ হয় নাই। মু'আবীয়া (রা.) এর অন্তরে ধারণা জন্মিল যে, যুদ্ধ বিরতির সময় তো যথাযথই রয়েছে তবে সময়ের মধ্যেই স্বীয় সৈন্যদল নিয়ে রোম সীমান্ত অঞ্চলে বিন্যস্ত করে রাখব। যখন যুদ্ধ বিরতির সময় শেষ হয়ে যাবে তখন আমরা আকস্মিকভাবে আক্রমণ করে বসব। অন্যদিকে দুশমনের মধ্যে তখনো যুদ্ধের চিন্তা থাকবে না। চুক্তির সময়সীমা শেষ হবে তারপর তারা যুদ্ধ শুরু করার স্থান নির্ধারণ করবে এবং সেখানে আসতে তাদের সময় লাগবে। তন্মধ্যে মুসলমান সৈন্যবাহিনী আক্রমণ করবে। সুতরাং যদি আমরা সেনাবাহিনীদেরকে সীমা পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেই এবং সময় সীমা শেষ হতেই আক্রমণ করি তাহলে অতি দ্রুতই বিজয় অর্জন করা সম্ভব হবে।

এটাও অঙ্গীকারের বিপরীত

এতদ উদ্দেশ্যে হযরত মু'আবীয়া (রা.) স্বীয় সেনাবাহিনীকে সীমান্তঞ্চলে বিন্যস্ত করেন এবং কিছু সংখ্যক সৈন্য সীমানার অভ্যন্তরে স্থাপন করে দেন ও আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুতি নিতে বলেন। ফলে যখনই

যুদ্ধ বন্ধের শেষ নির্ধারিত তারিখ হলো হযরত মু'আবীয়া (রা.) তৎক্ষণাৎ সৈন্যবাহিনীকে সম্মুখ পানে অগ্রসর হবার জন্যে অনুমতি প্রদান করলেন। অতঃপর সৈন্যবাহিনী যখনই সম্মুখে অগ্রসর হলো তখন এ কৌশল অবলম্বন করা অত্যন্ত সফলতার প্রমাণ দিল। কারণ সেখানকার লোকজন ঐ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না।

হযরত মু'আবীয়া (রা.) নগরীর পর নগরী, গ্রামের পর গ্রাম বিজয় করে যেতে লাগলেন। সৈন্যবাহিনী বিজয়ের নেশায় সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছিলেন। অকস্মাৎ দেখতে পেলেন যে পশ্চাদ থেকে এক অশ্বারোহী দৌড়ে চলে আসছে। তাকে দেখতে পেয়ে হযরত মুআবীয়া (রা.) যুদ্ধ বন্ধ করে তাঁর অপেক্ষায় রইলেন। তিনি ভাবলেন সম্ভবত আমীরুল মুমিনীন কোন নতুন সংবাদ নিয়ে আসছে। সে অশ্বারোহী যখন নিকটবর্তী হয়ে আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার বলে আওয়াজ দিতে লাগলেন এবং বলতে লাগলো থাম! হে আল্লাহর বান্দাগণ তোমরা থাম! তিনি যখন আরো নিকটবর্তী হলেন তখন হযরত মুআবিয়া (রা.) দেখলেন যে, তিনি হলেন আমর বিন আবাছাহ (রা.)। হযরত মু'আবীয়া (রা.) জিজ্ঞেস করলেন কি খবর? তিনি বললেন, মুমিনের আদর্শ হলো অঙ্গীকার পূর্ণ করা, প্রতারণা না করা। অঙ্গীকার ভঙ্গ না করা। হযরত মু'আবীয়া (রা.) বললেন, আমিতো কোন অঙ্গীকার ভঙ্গ করিনি। আমিতো আক্রমণ ঐ সময় করেছি, যখন যুদ্ধবিরতির সময়সীমা শেষ হয়ে গিয়েছিল। হযরত আমার বিন আবাছাহ (রা.) বললেন, যদিও যুদ্ধবিরতির সময় নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আপনিতো স্বীয় সৈন্য বাহিনীকে যুদ্ধ বিরতির সময়কাল থেকেই তাদের সীমানায় পৌছিয়ে দিয়েছিলেন এবং কিছু সংখ্যক সীমান্তাঞ্চলের ভিতরে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছিলেন এবং তা ছিল যুদ্ধ বিরতি চুক্তির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। আমি আমার এ কানগুলি দ্বারা রাসূল (সা.)কে বলতে শুনেছি যে, "যখনই কোন গোত্রের সাথে তোমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের চুক্তি ভঙ্গ করবেনা যতক্ষণ পর্যন্ত তার সময়সীমা অতিক্রম করবে। অথবা প্রকাশ্যভাবে তাদের সামনে বলে দেবে যে, আমরা সে অঙ্গীকার শেষ করে দিলাম।" (তিরমিযী হাদীস ঃ ১৫৮০)। সুতরাং সময়সীমা অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে অথবা চুক্তি সমাপ্তি করার ঘোষণা না দিয়ে সীমান্তের নিকট সৈন্যবাহিনী বিন্যস্ত করা হুযূর (সা.)-র হাদীস অনুযায়ী আপনার জন্যে বৈধ ছিলনা।

সমস্ত বিজিত অঞ্চল ফিরিয়ে দিলেন

এবার আপনারা লক্ষ করুন যে, একজন বিজয়ী সৈনিক যিনি শত্রু বাহিনীর অঞ্চলসমূহ বিজয় করে যেতে থাকেন এবং অনেক বড় এলাকা বিজয় করে নিয়েছেন এবং বিজয়ের জন্য পাগল পারা। কিন্তু যখনই হুযূরের (সা.) অমীয় বাণী শুনলেন যে, স্বীয় চুক্তির প্রতি যত্নবান থাকা মুসলমানদের জন্যে আবশ্যকীয়। তৎক্ষণাৎ হযরত মু'আবীয়া (রা.) নির্দেশ দিলেন যে, "যতটুকু এলাকা বিজয় হয়েছে সম্পূর্ণই ফিরিয়ে দাও।" তাঁর বাহিনী বিজিত এলাকা প্রত্যার্পণ করে নিজ সীমানায় প্রত্যাবর্তন করলেন। বিশ্বের ইতিহাসে অন্য কোন জাতিই এরূপ দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে নাই যে কেবল চুক্তি ভঙ্গ করার কারণে স্বীয় বিজিত অঞ্চল প্রত্যার্পণ করেছে। যেহেতু কোন ভূ-খন্ড উদ্দেশ্য ছিলনা, কোন প্রকারের নেতৃত্ব বা রাজত্ব লাভ করা উদ্দেশ্য ছিলনা। সে জন্যেই যখনই আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ সম্পর্কে অবগত হলেন যে প্রতিশ্রুতি পরিপন্থী কাজ ঠিক না। আবার যেহেতু অঙ্গীকার ভঙ্গের সামান্যতম সংশয় বিদ্যমান ছিল। এ জন্যে তিনি ফিরে গেলেন। এই হচ্ছে অঙ্গীকার রক্ষা। মুসলমান কোন কথা দিলে তার বিপরীত হবে না। এটাইতো হওয়া চাই মুমিনের বৈশিষ্ট্য।

হযরত উমর ফারুক (রাঃ) এবং চুক্তি

হযরত ফারুকে আজম (রা.) যখন বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয় করলেন, তখন সেখানে যে সকল খৃস্টান এবং ইহুদীরা ছিল, তাদের সাথে এ চুক্তি করেছিলেন যে, আমরা তোমাদের জান ও মালের সংরক্ষণ করব। তার বিনিময়ে তোমরা আমাদিগকে জিযিয়া প্রদান করবে। জিযিয়া এক প্রকার কর, যা অমুসলিমদের থেকে আদায় করা হয়ে থাকে। সুতরাং যখন চুক্তি হয়ে গেল, তখন তারা প্রতি বৎসরই জিযিয়া আদায় করত। একদা এ ধরনের একটা ঘটনা ঘটে গেল যে, মুসলমানদের অন্য শত্রুদের সাথে যুদ্ধ বেধে গেল। যার ফলে বাইতুল মুকাদ্দাস নিযুক্ত সৈন্যদের প্রয়োজন দেখা দিল। কেউ কেউ আমিরুল মুমিনীনকে পরামর্শ দিলেন যে, সৈন্য-বাহিনীর অপ্রতুলতা যেহেতু দেখা দিয়েছে, সেহেতু বাইতুল মুকাদ্দাসে নিযুক্ত

সৈন্যদেরকে সেখান থেকে যুদ্ধের ময়দানে পাঠিয়ে দিন। হযরত উমর ফারুক (রা.) বললেন যে, আপনারা যে পরামর্শ দিয়েছেন তা অত্যন্ত ভাল। সৈন্যবাহিনী সেখান থেকে যুদ্ধের ময়দানে পাঠিয়ে দিন। এর সাথে আরেকটি কাজ করুন আর তা হচ্ছে এই যে, বায়তুল মুকাদ্দাস বসবাসকারী যে সকল ইহুদী ও খৃস্টান রয়েছে তাদেরকে এক স্থানে একত্রিত করে তাদেরকে বলে দিন যে, আমরা আপনাদের জান-মালের হিফাজত করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলাম এবং এ চুক্তিও করেছিলাম যে, আমরা আপনাদের জান-মালের হিফাজত করবো। এ উদ্দেশ্যে আমরা এখানে সৈন্য মোতায়েন করেছিলাম। কিন্তু এ মুহূর্তে আমাদের অন্যত্র সৈন্যের প্রয়োজন পড়েছে। এজন্য আমরা আপনাদের তত্ত্বাবধান করতে পারছিনা। সুতরাং এ বৎসর আপনারা আমাদিগকে যে জিযিয়া প্রদান করেছেন, তা আমরা ফিরিয়ে দিচ্ছি এবং এর পর পরই আমাদের সৈন্য নিয়ে যাব। এখন আপনারা নিজেদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিজেরাই করে নিন। আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, পৃথিবীতে এমন কোন জাতির দৃষ্টান্ত নেই, যারা ভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকদের সাথে এমন আচরণ করেছে।

অঙ্গীকার ভঙ্গ করার প্রচলিত দিক

মুনাফিকের দ্বিতীয় পরিচয় যা হুযূর (সা.) এ হাদীসে বর্ণনা করেছেন তা হচ্ছে এই যে, অঙ্গীকার ভঙ্গ করা। এ থেকে প্রত্যেক মুসলমানকেই বাঁচতে হবে। যেমনিভাবে আমি মিথ্যার ব্যাপারে পিছনে আলোচনা করেছিলাম যে, মিথ্যার এমন অনেক প্রকার রয়েছে যাকে আমরা মিথ্যা মনে করিনা এবং এ গুলিকে মিথ্যার তালিকা থেকে বাদ দিয়েছি। অনুরূপভাবে অঙ্গীকার ভঙ্গেরও বিভিন্নরূপ রয়েছে। অনেক অঙ্গীকার ভঙ্গকেও আমরা তালিকা থেকে বাদ দেয়েছি। যদি কাউকে বলা হয় যে, অঙ্গীকার ভঙ্গ করা কি ভাল কাজ? তখন প্রতি উত্তরে তিনি বলবেন যে, ইহা তো নিতান্তই খারাপ এবং গুনাহর বিষয়। কিন্তু তারাই কর্মজীবনে অঙ্গীকার ভঙ্গ করে বসে এবং এ অঙ্গীকর ভঙ্গ করাকে অঙ্গীকার ভঙ্গ বলে মনেই করে না।

রাষ্ট্রীয় আইনের অনুসরণ করা ওয়াজিব

দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি বিষয়ের আলোচনা পেশ করতে চাই, যার প্রতি সাধারণ লোকের কোন ভ্রুক্ষেপই নেই এবং ইহাকে ধর্মের কোন বিষয় বলে মনে করেনা। আমার সম্মানিত পিতা হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহঃ) (আল্লাহ তা'আলা তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করুন, আমীন।) বলতেন যে, অঙ্গীকার কেবল জবান দ্বারাই হয়না। বরং অঙ্গীকার কর্মের দ্বারাও হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, কোন ব্যক্তি যখন কোন রাষ্ট্রের প্রজা হিসেবে বসবাস করে তখন সে ব্যক্তি কার্যতই রাষ্ট্রের সাথে এ অঙ্গীকার করে থাকে যে, আমি এই রাষ্ট্রের যাবতীয় আইনসমূহ মেনে চলব। সুতরাং তখন তার জন্যে সে অঙ্গীকারসমূহ মান্য করে চলা ওয়াজিব হয়ে যায়, যতক্ষণ পর্যন্ত সেই রাষ্ট্রের আইন কোন প্রকারের গুনাহ করত বাধ্য না করে। তবে যদি আইন তকে গুনাহ করতে বাধা করে তাহলে সে আইনের উপর আমল করা জায়েজ নয়। এ ব্যাপারে রাসূলে কারীম (সাঃ) ইরশাদ করেন ঃ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِيْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ অর্থাৎ আল্লাহর অবাধ্যতার মাঝে কোন সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবেনা।

(মুসান্নেফ ইবনে আবী শায়বা, দ্বাদশ খন্ড, : ৫৪৬)

সুতরাং এমন আইনের অনুসরণ ওয়াজিবতো নয়ই বরং জায়েজেও নয়। কিন্তু কোন আইন যদি এমন হয় যা আপনাকে গুনাহ করতে বাধ্য করে না, তখন সে আইনের অনুসরণ করা এ জন্যেই ওয়াজিব যে, আপনিতো কার্যত সে রাষ্ট্রের আইন-কানুন মেনে চলার অঙ্গীকার করেছেন।

হযরত মূসা (আঃ) ও ফিরা'আউনের আইন

এ প্রসঙ্গে উদাহরণ স্বরূপ আমার সম্মানিত পিতা হযরত মুফতী শফী (রাহঃ) হযরত মূসা (আঃ) এর ঘটনা শুনাইতেন। হযরত মূসা (আঃ) ফের'আউনের রাষ্ট্রে বসবাস করতেন এবং নবুয়তপ্রাপ্তির পূর্বে একজন কিবতীকে চপেটাঘাত করে হত্যা করেছিলেন। যে ঘটনাটি প্রসিদ্ধ রয়েছে। কুরআনে কারীমেও এ ঘটনার আলোচনা রয়েছে। হযরত মূসা (আঃ) সে হত্যার প্রেক্ষিতে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন এবং বলতেন– وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ আমার প্রতি তাদের অভিযোগ রয়েছে। (সূরা আশশু'আরা, আয়াত নং ১৪)

এবং আমি তাদের নিকট একটি অপরাধ করেছি। হযরত মূসা (আঃ) ইহাকে অপরাধ ও গুনাহ মনে করতেন। তাই তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। এখন প্রশ্ন জাগে যে, মূসা (আঃ) যে কিবতীকে হত্যা করেছিলেন সে ছিল কাফের (আবার তাও ছিল হরবী কাফের)। এই হরবী কাফেরকে হত্যা করায় কিসের গুনাহ হলো? আমার পিতা হযরত মাওঃ মুফতী মুহাম্মদ শফী (রাহঃ) বলতেন যে, এ কাজটি এ জন্যেই গুনাহ হলো যে, হযরত মূসা (আঃ) সে শহরে বসবাস করতেন। তাই কার্যত অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলেন যে, আমি এই রাষ্ট্রের সকল আইন-কানূনের অনুসরণ করব। ঐ শহর বা রাষ্ট্রের বিধান মতে কাউকে হত্যা করা বৈধ ছিলনা। তাই হযরত মূসা (আঃ) এর কৃত হত্যা ছিল প্রচলিত নীতিমালার পরিপন্থী। অতএব সকল রাষ্ট্রের সকল অধিবাসীই কার্যত এই অঙ্গীকারে আবদ্ধ যে, সে রাষ্ট্রের সকল বিধি-বিধান মেনে চলব, যতক্ষণ পর্যন্ত সে আইন কোন গুনাহর কাজ করতে বাধ্য না করে।

ভিসা গ্রহণ করা কার্যত একটি অঙ্গীকার

অনুরূপভাবে যখন আপনি ভিসা নিয়ে অন্য রাষ্ট্রে যাবেন। যদি তা রাষ্ট্রও হয় যেমন আমেরিকা অথবা ইউরোপ। তখন এ ভিসাটি কার্যত এই অঙ্গীকার প্রদান যে, আমি শক্তি থাকা পর্যন্ত সে দেশের সকল বিধি-বিধান মেনে চলব। যতক্ষণ পর্যন্ত সে আইন-কানুন কোন প্রকারের গুনাহের কাজে বাধ্য করে, তাহলে সে আইন মান্য করা বৈধ নয়। সুতরাং যে সকল আইন-কানুন মানুষকে কোন প্রকার গুনাহের কাজ করতে বাধ্য না করে, অথবা চরম অত্যাচারের কারণ না হয়, সে সকল বিধি-বিধান মান্য করাও অঙ্গীকার পূর্ণ করার অন্তর্ভুক্ত।

ট্রাফিক আইন বিরোধী কাজ করাও গুনাহ

উদাহরণত ট্রাফিক আইন হলো রাস্তার ডান পার্শ্বে চলা অথবা বাম পার্শ্বে চলা, অথবা এ আইন হলো যখন সিগন্যাল এর লাল বাতি জলে উঠবে, তখন চলাচল বন্ধ করা। বস্তুত আপনি একজন শহরের অধিবাসী

হিসেবে এ কথার অঙ্গীকার করলেন যে, আমি এ সকল আইন মেনে চলব। সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি সে আইন মেনে না চলে তাহলে, তা অঙ্গীকার ভঙ্গ ও গুনাহ হবে। মানুষ মনে করে থাকে যদি ট্রাফিক আইন মেনে না চলে তাহলে আবার গুনাহ কিসের? মানুষতো তাহলে দেখা যায়, যে মানুষ নিজকে নিজে বড় খুব চতুর ও সচেতন হিসেবে প্রকাশ করার জন্যে নীতিবিরোধী কাজ করে আর আইনের ফাঁক-ফোকর খুঁজে বেড়ায়।

ইহজগৎ ও পরজগতের দায়

স্মরণ রাখুন, তা কয়েকটি দিক দিয়ে গুনাহ (১) অঙ্গীকার ভঙ্গ করা হিসেবে গুনাহ (২) তা এদিক দিয়ে গুনাহ হবে যে, এ আইন কানূন বানানো হয়েছে যাতে নিয়মশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা হয়। আর আইনের কারণে একে অপরের ক্ষতি ও কষ্ট দেওয়ার রাস্তা বন্ধ হয়। সুতরাং আপনি যদি আইনবিরোধী কাজ করে থাকেন এবং এর ফলে অন্যের ক্ষতি হয়, তাহলে ঐ ক্ষতির দায়-দায়িত্ব দুনিয়া ও আখিরাতে আপনাকেই বহন করতে হবে।

দ্বীনের সাথে সম্পর্ক

এ সকল কথা এ জন্যেই বলা হচ্ছে যে, মানুষ মনে করে থাকে এ সকল কাজের সাথে দ্বীনের কি সম্পর্ক রয়েছে? এগুলো হচ্ছে জাগতিক কাজ। আর তার অনুসরণ করারই কি প্রয়োজন রয়েছে? অত্যন্ত ভালভাবে বুঝে নিন। এতো হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার দ্বীন যা আমাদের জীবন-যাপনের সর্বক্ষেত্রেই বিরাজিত। ধার্মিকতা কেবল কোন বিশেষ দিকের উপর সীমাবদ্ধ নয়। এ প্রসঙ্গে মোদ্দা কথা হলো, যে আইন কোন গুনাহ করতে বাধ্য করে তা তো কোন অবস্থাতেই মান্য করা যবেনা এবং যে আইন চরম অত্যাচারের কারণ হয় তাও মান্য করা যাবে না। এতদ্ব্যতীত যে সকল আইন-কানূন রয়েছে, শরীয়াতের দৃষ্টিতে আমাদের জন্যে তা মান্য করা ওয়াজিব। যদি মান্য না করা হয়, তাহলে অঙ্গীকার ভঙ্গ করার গুনাহ হবে।

সারসংক্ষেপ

অনেক বিষয়ই এমন রয়েছে যে গুলোকে আমরা অঙ্গীকার ভঙ্গ বলে মনে করি। আর অনেক বিষয় এমনও রয়েছে যে গুলোকে আমরা অঙ্গীকার ভঙ্গ বলে মনে করিনা; কিন্তু তা অঙ্গীকার ভঙ্গ করা ও গুনাহর অন্তর্ভুক্ত। তা থেকে বেঁচে থাকা একান্ত অপরিহার্য। দ্বীন আমাদের কর্মজীবনের সর্বক্ষেত্রে ব্যাপৃত। এ সকল বিষয়ের প্রতি সতর্ক না থাকা হবে ধর্মের বিরোধিতা। মুনাফিকের দুটি পরিচিতির বর্ণনা হলো, তৃতীয়টি হচ্ছে আমানতের খেয়ানত (গচ্ছিত সম্পদের আত্মসাৎ)। বহু কাজ এমন রয়েছে যা খেয়ানতের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু আমরা তাকে খেয়ানত বলে মনে করিনা। এসব নিয়ে পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে। আল্লাহ আমাদের এ সবের উপর আমল করার তৌফিক দান করুন। আমীন।

তৃতীয় অধ্যায়

খেয়ানত ও তার বিভিন্ন রূপ

সবচেয়ে বড় আমানত যা প্রত্যেক মানুষের রয়েছে, যা থেকে কোন মানুষই মুক্ত নয়। ইহা হলো মানুষের অস্তিত্ব ও তার জীবন-যাপন এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও তার সময়। কোন মানুষ কি এ কথা বলতে পারে যে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, হাত-পা ইত্যাদির মালিক আমি নিজে? যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই তা ব্যবহার করবো? কখনো নয়। বরং এ সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে ব্যবহার করার জন্য দান করেছেন। সুতরাং এ আমানাতের দাবী হলো নিজেদের অস্তিত্ব ও সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে নিজের সুস্থতা ও জ্ঞানকে শুধু সে কাজেই ব্যবহার করবে, যে কাজের জন্যে এগুলো দেওয়া হয়েছে। তা ব্যতীত অন্য কোন কাজে ব্যবহার করলে খেয়ানত হবে। হাদীস শরীফে নবী করীম (সা.) মুনাফিকের তিনটি নিদর্শন উল্লেখ করেছেন। এর দ্বারা এটা স্পষ্ট হয় যে, এ তিনটি কাজ কোন মুমিনের কাজ নয়। এ তিনটি কাজ যাদের মধ্যে পাওয়া যায় সঠিক অর্থে তাদেরকে মুসলমান বা মু'মিন বলা যায় না।

আমানতের গুরুত্ব

মুনাফিকের তৃতীয় পরিচিতি হচ্ছে গচ্ছিত বস্তুতে খেয়ানত করা, অর্থাৎ কোন মুসলমানের কাজ নয় যে সে আমানতের মধ্যে খেয়ানত করবে। বরং তা'হলো মুনাফিকের কাজ। অনেক আয়াত ও হাদীস দ্বারা আমানতের ও আমানতের দাবীসমূহ পূর্ণ করার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমে ঘোষণা দেন ঃ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوْا الاَمٰنٰتِ اِلٰى اَهْلِهَا "নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদিগকে নির্দেশ দেন যে, তোমরা প্রাপ্য আমানতসমূহ প্রাপকদের নিকট পৌঁছে দাও।" (সূরা নিসা ঃ ৫৮) আমানতের প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করে এক হাদীসে নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন لاَاِيْمَانَ لِمَنْ لاَ اَمَانَةَ لَهُ অর্থাৎ যার আমানতদারী নেই তার ঈমানও নেই। সুতরাং ঈমানের দাবির জন্য আমানতদার হওয়া আবশ্যকীয়। (মোঃ আ, ৩ঃ১৩৫)

আমানতের পরিসর

আমরা আমানতের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য অত্যন্ত সীমিত করে বুঝে থাকি। আমরা আমানত দ্বারা শুধু এতটুকুই বুঝে থাকি যে, কোন ব্যক্তি টাকা-পয়সা নিয়ে এসে বলল যে, এ পয়সাগুলো আপনার নিকট আমানত হিসেবে রেখে গেলাম। প্রয়োজনের সময়ে আপনার নিকট থেকে নিয়ে নেব। খিয়ানত বলতে বুঝি কেউ যদি গচ্ছিত টাকা-পয়সা ধ্বংস করে দেয় অথবা যখন সে ব্যক্তি নিজের টাকা চায়, তখন তা দিতে অস্বীকার করে, তাহলে আমানতের খেয়ানত হবে। আমাদের ধারণায় আমানত ও খেয়ানতের অনুভূতি শুধু এতটুকুই। তদাপেক্ষা বেশী আর কিছুই নয়। এতো আমানত ও খেয়ানতের একটি বিশেষ অংশ অবশ্যই। কিন্তু কুরআন-হাদীসের পরিভাষায় আমানত কেবল এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং আমানত অনেক ব্যাপক অর্থবোধক। এর মধ্যে অনেক কিছুই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। অনেক কিছুকে আমরা আমানত বলে মনে করি না, কিন্তু তা আমানতের মধ্যে পড়ে।

আমানতের তাৎপর্য

আরবী ভাষায় আমানতের অর্থ হলো কোন ব্যক্তির উপর কোন ব্যাপারে ভরসা করা। সুতরাং যে সকল জিনিস অন্যের নিকট অর্পণ করা হয়েছে আর অর্পণকারী ব্যক্তি তার প্রতি ভরসা করে যে সে তার হক যথার্থভাবে আদায় করবে। ইহা হলো আমানতের মূল অর্থ। বস্তুত, কোন ব্যক্তি কোন কাজ অথবা কোন বস্তু কিংবা কোন মাল যা অন্যের নিকট অর্পণ করে এবং অর্পণকারী ব্যক্তির এ দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে, সে ব্যক্তি দায়িত্বকে সঠিকভাবেই আদায় করবে। তাতে কোন প্রকারের ত্রুটি করবেনা। এটাই আমানাতের অর্থ। আমানতের এ অর্থ সামনে রাখা হলে অনেক বিষয়ই আমানতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

اَلَسْتُ এর দিনে আমানত গ্রহণ

আল্লাহ তা'আলা মানবজাতি হতে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন যে, আমি কি তোমাদের প্রভু নই? তোমরা আমার আনুগত্য করবে কি? সকল মানবগোষ্ঠীই স্বীকার করেছিল যে, আমরা নিশ্চয়ই আপনার আনুগত্য করবো। যে অঙ্গীকার সূরা আহযাবের সর্বশেষ রুকুতে আমানত হিসেবেই ব্যক্ত করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে–

اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ اِنَّهُ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلاً ـ

(সূরা আহযাব, আয়াত : ৭২)

অর্থাৎ, আমি আসমানের প্রতি আমানত পেশ করে জিজ্ঞেস করলাম যে, তুমি কি এর দায়িত্ব বহন করতে সক্ষম হবে? আসমান। তাতে অস্বীকৃতি জানাল। অতঃপর জমিনের প্রতি পেশ করলাম যে, তুমি কি এ আমানত বহন করতে সক্ষম? জমিনও অস্বীকার করলো। পরবর্তীতে পর্বতমালা সমূহের প্রতি এ আমানত পেশ করলাম যে, তোমরা কি তা বহন করতে সক্ষম? তারাও সে আমানত বহন করতে অপারগতা স্বীকার করলো। সকল সৃষ্টি জগৎই এ আমানত বহন করতে ভয় পেয়ে গেল, কিন্তু যখনই এ আমনত মানবজাতির নিকট পেশ করা হলো, তৎক্ষণাৎ অত্যন্ত বীরত্বের সাথে স্বীকার করে নিল যে আমার এ আমানতকে বহন করতে সক্ষম। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন যে, এ মানব গোষ্ঠী অত্যন্ত জালেম ও জাহেল মানুষ। এহেন ভারী বস্তুকে বহন করার জন্যে নিয়ে গেল। একথা ভাবেওনি যে, কখন না জানি বহন করতে আমি অক্ষম হয়ে পড়ি। যার ফলে আমার পরিণতি হবে ভয়াবহ।

এ জীবন হলো আমানত

একটা ভারী বস্তুকে আল্লাহ তা'আলা আমানত হিসেবে ব্যক্ত করেছেন। মানুষের নিকট যে আমানত পেশ করা হয়েছিল তা কি ছিল? মোফাস্সিরীনে কেরাম বলেন যে, এক্ষেত্রে আমানতের অর্থ মানবজাতিকে বলে দেয়া হয়েছিল যে, তোমাদেরকে একটি জীবন দেয়া হবে। এতে তোমাদেরকে ভাল কাজ করার অধিকার দেওয়া হবে এবং খারাপ কাজ করারও। আর যখন ভাল কাজ করবে তখন আমার সন্তুষ্টি লাভ করবে, চিরদিনের জন্যে বেহেস্তের নি'আমত তোমাদের লাভ হবে। আর যদি মন্দ কাজ কর তাহলে তোমরা আমার রোষানলের শিকার হবে। আর চিরদিনের জন্যে জাহান্নামের শাস্তি তোমাদের পতি পতিত হবে। এখন বলতো এমন জীবন তোমাদের কাম্য কি না? সুতরাং অন্য সকলেই তা অস্বীকার করল। কিন্তু মানুষ তা গ্রহণের জন্যে তৈরী হয়ে গেল। হাফেজ সিরাজী (রহঃ) এরই বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন ঃ

آسمان بار امانت نتوا نذكشيد ـ

قرعه فال بنام من ديوانه زو

অর্থাৎ আকাশ এ বোঝা বহন করেনি। সে তা বহন করতে অস্বীকার করে বলল, এ বোঝা বহন করার শক্তি আমার নেই। কিন্তু এক মুষ্টি হাড্ডি ধারী এ মানবজাতি তা বহন করল এবং লটারীর চাকা আমর নামে বের হয়ে এলো। কুরআনে কারীমে একেই আমানত বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

এ সারাটা জীবন আমাদের নিকট আমানত। আর এ আমানতের দাবী হলো এ জীবনকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা.) নির্দেশ অনুযায়ী চালানো। সুতরাং সবচেয়ে বড় আমানত যা প্রত্যেক মানুষের নিকট রয়েছে, যা থেকে কোন ব্যক্তিই মুক্ত নন। সে আমানত হলো মানুষের অস্তিত্ব ও তার জীবন, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, ও সময়। এসব কিছুই আমানত, কোন মানুষ কি একথা মনে করতে পারে যে, আমি আমার হাতের মালিক, আমার চোখের মালিক আমি নিজেই। তা-তো এমন নয়, বরং এসব কিছুই আমাদের নিকট আমানত। আমরা এর মালিক নই। ফলে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে তাকে ব্যবহার করতে পারব না। বরং আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এ নিয়ামতসমূহ দান করেছেন ব্যবহার করার জন্যে। সুতরাং এ আমানতের দাবী হলো এ সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিজের অস্তিত্ব নিজ যোগ্যতা এবং নিজেদের বলবীর্যকে সে কাজেই ব্যবহার করা যে কাজের জন্যে দেওয়া হয়েছে। অন্য কোন কাজে ব্যবহার করা হলে তা আমানতের খিয়ানত হবে।

চক্ষু একটি নি'আমত

চক্ষু আল্লাহ তা'আলার একটি নি'আমত। যা আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দান করেছেন। এমন একটি নিআমত, যা দুনিয়ার সমুদয় মাল-সম্পদ খরচ করেও অর্জন করার চেষ্টা করলে তা অর্জন করা সম্ভব নয়। কিন্তু এর মূল্য বুঝে আসেন। কারণ জন্মলগ্ন হতেই এ ফ্রি মেশিনটি কাজ করে আসছে। এটা অর্জন করতে কোন টাকা-পয়সার প্রয়োজন হয়নি, কোন কষ্টও করতে হয়নি। কিন্তু যে দিন চোখের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হবে বা হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিবে তখনই এর মর্যাদা ও মূল্য বোঝা যাবে। আর সে অবস্থায় মানুষ তার সকল ধন-দৌলত দৃষ্টিশক্তির জন্যে খরচ করতে প্রস্তুত হয়ে যায়। এ ফ্রি মেশিনের কোন তৈলের প্রয়োজন হয়না। কোন ট্যাক্স দিতে হয়না। এর ভাড়াও দিতে হয়না। বরং বিনমূল্যেই এটা অর্জিত হয়েছে।

চক্ষু একটি আমানত

কিন্তু এ মেশিনটি আমানত স্বরূপ আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দিয়ে দিয়েছেন এবং নির্দেশ দিয়েছেন যে, এই মেশিনকে তোমরা সদ্ব্যবহার কর। এর দ্বারা দুনিয়া দেখ। দুনিয়ার দৃশ্য দেখ। দুনিয়ার দৃশ্য দেখে আনন্দ-ভোগ কর। সব কিছুই কর। কিন্তু কিছু কিছু জিনিস দেখতে নিষেধ করেছেন। ফ্রি এ মেশিনকে সকল কাজে ব্যবহার করবে না। যেমন নির্দেশ হচ্ছে এর দ্বারা তোমরা গায়রে মুহরামদেরকে দেখবে না। (যাদের সাথে বিবাহ জায়েজ)। এখন যদি আমরা গায়রে মুহরামদেরকে দেখি, তাহলে আল্লাহ তা'আলার আমানতে খিয়ানত হবে। এ জন্যেই কুরআনে কারীমে গায়রে মুহরামকে দেখা খিয়ানত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। সুতরাং আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأعْيُنِ (সূরা মু'মিন : ১৯) অর্থাৎ চোখের খেয়ানত সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা অবগত রয়েছেন যে, তোমরা তাকে এমন স্থানে ব্যবহার করেছ যে স্থানে ব্যবহার করা থেকে আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করে ছিলেন।

ব্যাপারটি এমন হলো যেমন নাকি কোন ব্যক্তি কোন মাল অপর এক ব্যক্তির নিকট আমানত স্বরূপ গচ্ছিত রাখলো। এবার সে ব্যক্তি দৃষ্টির আড়ালে গচ্ছিত মাল ব্যবহার করতে উদ্যত হয়। সেরকমই যেন সে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতের সাথে করছে। আর এ নির্বোধের সে জ্ঞানটুকুও নেই যে, আল্লাহ তা'আলার নিকট কোন কাজই গোপন থাকতে পারেনা। সে জন্যেই আল্লাহ তা'আলা চোখের খিয়ানতকে বড় গুনাহ ও অপরাধ বলেই চিহ্নিত করেছেন, নবী করীম (সা.) এর প্রতি অত্যন্ত সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেছেন। আর চোখের এই আমানত ও নি'আমতকে যদি যথার্থ স্থানে ব্যবহার করে, তা হলে আল্লাহ তা'আলার রহমত অবতীর্ণ হবে। হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে যে, কোন ব্যক্তি যদি বাহির থেকে ঘরে এসে স্বীয় স্ত্রীর দিকে ভালবাসার দৃষ্টিতে তাকায় এবং স্ত্রী ও স্বামীর প্রতি ভালবাসার দৃষ্টিতে তাকায় তখন আল্লাহ তা'আলা উভয় জনের প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে তাকান। কারণ হচ্ছে, তারা সে আমানতকে সঠিক স্থানে ব্যবহার করছে। যদিও তারা নিজেদের প্রবৃত্তি বা উপকারের জন্যে করে থাকে। যেহেতু আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ অনুযায়ী করেছে সে জন্যে তাদের প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হলো।

কান একটি আমানত

অনুরূপ আল্লাহ তা'আলা শ্রবণ করার জন্য কান দান করেছেন। আবার সবকিছুই শ্রবণ করার অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু কয়েকটি জিনিসের উপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছেন যে, তোমরা গান-বাজনা শোনবে না। গীবত, নাট্যানুষ্ঠান এবং মিথ্যাচার শোনবে না। যদি কান এ সকল বিষয় শ্রবণ করার কার্যে ব্যবহার হয় তাহলে তা হবে আমানতের খেয়ানত।

জিহ্বা একটি আমানত

"জিহ্বা" খোদা প্রদত্ত এমন একটি নি'আমত, যা জন্মলগ্ন হতে চলে আসছে। মৃত্যু পর্যন্ত তা চলবেই। জিহ্বার সামান্যতম নড়া-চড়ার দ্বারা মানুষ কৃতইনা কাজ করে যাচ্ছে। জিহ্বা এমন একটি বড় নি'আমত, যদি জিহ্বা নাড়িয়ে একবার সুবহানাল্লাহ বলে হাদীস শরীফে আসছে আমলের পাল্লা অর্ধেক ভরে যাবে। সুতরাং এর মাধ্যমে আখিরাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করার প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু সে জিহ্বা যদি মিথ্যা বলার মধ্যে ব্যবহৃত হয়, গীবত বলার মধ্যে ব্যবহৃত হয়, মুসলমানদের অন্তরে কষ্ট দেওয়ার কার্যে ব্যবহৃত হয় এবং অন্যকে কষ্ট দেওয়ার জন্যে ব্যবহৃত করা হয়, তাহলে তা হবে আমানতের খেয়ানত।

আত্মহত্যা হারাম কেন?

এ তো ছিল কেবল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পর্কীয়। আমাদের পূর্ণ অস্তিত্ব, সমুদয় শরীরই আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত আমানত। কারো কারো ধারণা শরীর আমাদের নিজেরই। সুতরাং আমরা এর সাথে যথেচ্ছা আচরণ করব। প্রকৃতপক্ষে তা নয়। বরং এ শরীর আল্লাহর দেয়া আমানত। সে জন্যেই শরীয়তের দৃষ্টিকোণে আত্মহত্যা করা হারাম। এ শরীর যদি আমাদেরই হতো তাহলে আত্মহত্যা করা কেন হারাম হবে? আত্মহত্যা এজন্যেই হারাম যে, এ প্রাণ, এ শরীর, এ অস্তিত্ব, এ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ইত্যাদির প্রকৃত মালিক আমি নই। বরং তা আল্লাহ তা'আলার মালিকানাধীন। উদাহরণ স্বরূপ একটি কিতাবের মালিকানা আমার। এখন আমি যদি কাউকে বলি যে, তুমি এ কিতাবটি নিয়ে যাও, এমন কাজ করা আমার জন্যে জায়েয হবে। কিন্তু কোন কোন ব্যক্তি যদি অপর ব্যক্তিকে বলে যে, আমাকে হত্যা করে ফেল, আমার প্রাণ নিয়ে যাও, এখন সে হত্যা করার অনুমতি দিয়ে দিল। ষ্ট্যাম্পের উপর লিখে দিল, স্বাক্ষর করে সীল এটে দিল. সবকিছু করে দিল তা সত্তেও যাকে হত্যা করার অনুমতি দিয়েছিল

তার জন্যে হত্যা করা জায়েজ হবেনা কেন? তার কারণ হলো, এ প্রাণের মালিক সে নিজে নয়। যদি তার মালিকানাধীন হতো তাহলে তো কাউকে নিয়ে যাবার অনুমতি দিতে পারত। সুতরাং মালিকানাই যেহেতু নেই, সেহেতু কাউকে দেওয়ার অধিকার নেই এবং নিজেকে নিজে ধ্বংস করারও অধিকার নেই।

গুনাহ করা খেয়ানত

আল্লাহ তা'আলা এ পরিপূর্ণ দেহ, প্রাণ সুস্থতা এবং শক্তি সামর্থ্য সব কিছুই আমাদেরকে আমানত হিসেবে দান করেছেন। বস্তুত গভীরভাবে লক্ষ করলে দেখা যায় এ পূর্ণ জীবনটাই আমানত। সুতরাং এ জীবনের কোন কর্মসূচি এবং সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা সম্পাদিত কোন আমল, কোন কথা এবং কোন কাজ যেন এমন না হয়, যা আল্লাহ তা'আলার দেওয়া আমানতের খিয়ানতের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং আমানতের যে সীমা রেখা আমাদের ধারণায় রয়েছে যে, কোন ব্যক্তি যদি টাকা-পয়সা রেখে যায় এবং আমরা সিন্দুক খুলে সে টাকা-পয়সা তাতে রেখে দেই। এবার যদি সে পয়সা বের করে খরচ করে ফেলি তাহলে ইহা খিয়ানত হবে। কেবল ইহাই আমানত নয়। বরং এ পূর্ণ জীবনটাই হচ্ছে আমানত। আলোচনা করা হয়েছে যে, আমানতের খেয়ানত করা নিফাকের পরিচায়ক। এর উদ্দেশ্য হলো গুনাহ যত প্রকারের হোক না কেন– চোখের গুনাহ হোক অথবা কর্ণের গুনাহ, অথাব জিহ্বার গুনাহ বা অন্য কোন অঙ্গের গুনাহ, সবকিছুই আমানতের খেয়ানত করার অন্তর্ভুক্ত। আর তা মুমিনের কাজ নয়। বরং তা হলো মুনাফিকের কাজ।

কর্জ করা বস্তুও আমানত

এ পর্যন্ত তো আমানত সম্পর্কীয় ব্যাপক আলোচনা ছিল। কিন্তু আমানতের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রও রয়েছে। কোন কোন সময় আমরা তাকে আমানত বলে মনে করি না ও আমানতের ন্যায় রক্ষণাবেক্ষণ করিনা। যেমন, কর্জ করা বস্তু। কর্জ তাকেই বলা হয় যে, কোন এক ব্যক্তির কোন বস্তুর প্রয়োজন হলো। কিন্তু তা তার নিকট ছিল না। এ জন্যে সে বস্তুটি ব্যবহার করার জন্যে অন্য কারোর নিকট চাইল যে, অমুক জিনিসের আমার প্রয়োজন পড়েছে। সামান্য সময়ের জন্য তা দিন। এখন এ ধার হলো আমানত। উদাহরণত একটি কিতাব পড়ার আমার ইচ্ছে হলো অথচ

কিতাবটি আমার নিকট ছিল না। সুতরাং আমি তা পড়ার জন্যে অন্য কারোও নিকট হতে চেয়ে আনলাম যে, আমি তা পড়ে ফিরিয়ে দেব। এখন এ কিতাব আমার নিকট হলো ধার বা আমানত। শরীয়তের পরিভাষায় তাকে আরিয়ত বা ধার বলা হয়। পক্ষান্তরে ধারের এ জিনিস আমানত হয়ে থাকে। বস্তুত মালিকের অসন্তোষজনকভাবে সে বস্তুটির ব্যবহার করা ধার গ্রহণকারী ব্যক্তির জন্য বৈধ হবে না। মালিকের জন্য কষ্টদায়ক হয় এমনভাবে ধারের বস্তুটি ব্যবহার করা অনুচিত। আর দ্বিতীয় কথা হলো যথা সময়ে মালিকের নিকট তা পৌঁছিয়ে দিতে হবে।

পাত্রটি আমানত

হযরত মাওলানা আশ্রাফ আলী থানুভী (রাহঃ) তাঁর অসংখ্য ওয়াজেই এ বিষয়ে সতর্ক করতেন যে, মানুষ প্রায় সময়ই এ ধরনের করে থাকে, যখন তাদের ঘরে অন্য কেউ খাদ্যদ্রব্য পাঠিয়ে দেয়। খাদ্য প্রেরণকারী ব্যক্তি নিঃসন্দেহে খাদ্য প্রেরণ করে ভুল করে নাই। কিন্তু তার পাত্রটি তৎক্ষণাৎ ফিরিয়ে দেয়া হয় না। সঠিক নিয়ম ছিল সে খাদ্য অন্য পাত্রে রেখে তা তৎক্ষণাৎ তাকে ফিরিয়ে দেয়া। কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে দেখা যায় খাদ্য প্রেরণকারী ব্যক্তি সে পাত্র থেকেও বঞ্চিত হয়ে যায়। সুতরাং সে পাত্র ঘরেই পড়ে রইল। ফিরিয়ে দেওয়ার কোন চিন্তাই নেই। ঘটনা চক্রে এমনও হয়ে থাকে যে, সে পাত্রসমূহ নিজেও ব্যবহার করতে আরম্ভ করে। এটাও আমানতের খেয়ানত বলে গণ্য। কারণ হলো সে পাত্রটি আপনার নিকট ধার হিসেবেই এসেছিল। আপনাকে মালিক বানানো হয়ে ছিল না। সুতরাং সে পাত্রটিকে ব্যবহার করা, তাকে ফিরিয়ে দেওয়ার চিন্তা না করাও আমানতের খেয়ানত বলে গণ্য হবে।

কিতাবটি আমানত

অথবা আপনি কারো নিকট হতে পড়ার জন্য কিতাব নিলেন। কিতাব পড়ে তা মালিকের নিকট পৌঁছিয়ে দেন নি। ইহাও আমানতের খিয়ানত হলো। এমন কি বর্তমান লোকালয়ে এ প্রবাদ রয়েছে যে, "কিতাব চুরি করা জায়েজ আছে"। কিতাব চুরি করা জায়েজ হলে আমানতের খেয়ানত করা তো আরো উত্তম ধরনের জায়েজ হবে। আমানতের খেয়ানতের অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপভাবে, ধার হিসেবে যা কিছু আপনার নিকট আসে এগুলিকে সযত্নে রাখা ও মালিকের অসন্তোষজনক পন্থায় ব্যবহার না করা ওয়াজেব। তার বিপরীত করা জায়েজ নয়।

অফিস টাইম হলো আমানত

অনুরূপভাবে কোন এক ব্যক্তি কোথাও চাকুরী গ্রহণ করে এবং চাকুরীর মধ্যে যদি আট ঘন্টা সময় কাজ করার চুক্তি হয়ে থাকে। তাহলে এ আট ঘন্টা সময় আপনি তার নিকট বিক্রি করে দিলেন। সুতরাং এ আট ঘন্টা সময় আপনার নিকট সে ব্যক্তির আমানত। যার নিকট আপনি চাকুরী গ্রহণ করলেন। অতএব, এ আট ঘন্টা সময়ের মধ্যে একটি মিনিটও আপনি এমন কোন কাজে ব্যয় করলেন যে কাজে ব্যয় করা মালিকের পক্ষ থেকে অনুমোদিত ছিল না। তা আমানতের খেয়ানত হবে। যেমন কর্তব্যরত সময়ের মধ্যে কোন বন্ধু বান্ধব সাক্ষাৎ করতে আসল, এবার তার সাথে হোটেলে বসে আলাপ-আলোচনায় মত্ত থাকলেন। আর সময়টি তাতেই ব্যয় হয়ে গেল। অথচ আপনার এ সময়টা বিক্রি করা হয়েছিল। তা আপনার নিকট ছিল আমানত। আপনি সে সময়টুকুকে আনন্দ-উল্লাসে ব্যয় করে দিলেন। এটাও হবে আমানতের খেয়ানত। এবার বলুন! আমরা কত অমনোযোগী। আমাদের যে সময়সমূহ বিক্রিত হয়েছিল, আমরা তাকে অন্য কাজে ব্যবহার করেছি। এতে করে মাসের শেষে যে বেতন পাওয়া যায় তা পরিপূর্ণ হালাল হলোনা। কারণ পূর্ণ সময় দেওয়া হয় নাই।

দারুল উলুম দেওবন্দের উস্তাদগণের দায়িত্ব পালন

দারুল উলুমে দেওবন্দের হযরত উস্তাদগণের প্রতি লক্ষ করুন। প্রকারান্তরে আল্লাহ তা'আলা তাঁদের মাধ্যমে সাহাবায়ে কেরামের সময়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। সে সকল হযরত উস্তাদগণের মাসিক বেতন ছিল (১০) দশ টাকা অথবা (১৫) পনের টাকা। যেহেতু বেতন নির্ধারিত হয়ে গেছে এবং নিজের সময়টুকুও মাদ্রাসার নিকট বিক্রি করে দিয়েছে। সে জন্যেই সকল সম্মানিত উস্তাদগণের এ কর্মপন্থা ছিল যে, যদি মাদ্রাসার সময় কোন মেহমান আসত অথবা কোন বন্ধু সাক্ষাৎ করার জন্যে আসত তাহলে সে মেহমান আসা মাত্রই ঘড়ি দেখে সে সময়টুকু নোট করে রাখতেন, তারপর শীঘ্রই কাজ সমাধা করতে সচেষ্ট হতেন। আবার মেহমান যখন চলে যেতেন তখন সে সময়টুকু ঘড়ি দেখে নোট করে নিতেন। সারা মাস এরূপ নোট করে রাখতেন। অতঃপর যখন মাস শেষ হয়ে যেত তখন সে উস্তাদগণ যথারীতি দরখাস্ত পেশ করতেন যে, এ মাসে

আমি এতটুকু সময় মাদরাসার কাজের বাহিরে ব্যয় করেছি। সুতরাং অনুগ্রহপূর্বক আমার বেতন হতে উক্ত সময়ের পয়সা কেটে রেখে দিন। তাঁরা এমন এ জন্যেই করছিলেন যে, যদি তাঁরা এ সময়ের বেতন গ্রহণ করে তাহলে তা আমাদের জন্যে হারাম হবে। সে জন্যেই তাঁরা তা ফিরিয়ে দিতেন। বর্তমানে বেতন বৃদ্ধির জন্যে দরখাস্ত দেওয়া হয়। আর বেতন কাটার জন্যে দরখাস্ত দেওার কথা ভাবাও যায়না।

হযরত শাইখুল হিন্দের (রাহঃ) বেতন

শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান (রহঃ) যিনি ছিলেন দারুল উলুম দেওবন্দের প্রথম ছাত্র। যাঁর মাধ্যমে দারুল উলুম দেওবন্দের যাত্রা শুরু হয়। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ইল্‌ম ও মা'রিফাতের উচু মর্যাদা দান করেছিলেন। যখন তিনি দারুল উলুম দেওবন্দের শায়খুল হাদীস ছিলেন, তখন তাঁর মাসিক বেতন ছিল দশ টাকা। অতঃপর যখন তার বয়স বেড়ে গেল এবং অভিজ্ঞতাও বৃদ্ধি পেল তখন দারুল উলুম দেওবন্দের মজলিসে শুরু সিদ্ধান্ত করলো যে, হযরতের বেতন খুবই কম হয়েছে। যখন তার বয়স বৃদ্ধি পেয়েছে তাঁর প্রয়োজনীয়তাও অবশ্য বেড়েছে, বেড়ে গিয়েছে চিন্তা-ভাবনা। অতএব তাঁর বেতন বৃদ্ধি করা উচিৎ। সুতরাং মজিলেসে শুরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলো যে, তাঁর বেতন দশ টাকার স্থলে পনের টাকা ধার্য করা হোক। যখন বেতন বন্টন করা হলো, তখন দেখলেন যে, তাঁকে দশ টাকার পরিবর্তে পনের টাকা দেওয়া হচ্ছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন যে, আমাকে পনের টাকা দেওয়া হচ্ছে কেন? লোকেরা প্রতি উত্তরে বললেন যে, মজলিসে শুরা এ ফয়সালা করেছে যে, আপনার বেতন দশ টাকার পরিবর্তে পনের টাকা করা হবে, তিনি এ বেতন নিতে অস্বীকার করলেন এবং দারুল উলুম দেওবন্দের মোহতামীম সাহেব বরাবর একটি দরখাস্ত লিখলেন। হযরত! আপনি আমার বেতন দশ টাকার স্থলে পনের টাকা নির্ধারণ করেছেন। অথচ এখন আমি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি। প্রথম দিকে আনন্দ চিত্তে তিন ঘন্টা পড়াতাম। এখন তো আমি কম পড়াচ্ছি, সময় দিয়ে থাকি কম। তাই আমার বেতন বৃদ্ধি করার কোন বৈধতা নেই। সুতরাং আপনারা যে বেতন বৃদ্ধি করেছেন, তা ফিরিয়ে নিন। আর আমার বেতন পূর্বের ন্যায় দশ টাকা করে দিন।

লোকেরা এসে হযরতের নিকট বিনয়ের সাথে বলতে লাগলেন যে, হযরত! আপনি তাক্বওয়া ও পরহেজগারীর দৃষ্টিতে ফিরিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু অন্য লোকদের জন্যে তা কষ্টের কারণ হয়ে যাবে। আপনার জন্যে তাদের উন্নতি বন্দ হয়ে যাবে। সুতরাং আপনি তা কবুল করে নিন। কিন্তু তিনি তো পছন্দ করেননি। তার কারণ হলো তিনি সর্বদাই এই চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন যে, এ দুনিয়া অল্প দিনের। আল্লাহ তা'আলা জানেন যে, তা কি আজ শেষ হয়ে যাবে না কি কাল? তবে এ পয়সা যা আমার নিকট আসতেছে, তা যেন খোদার দরবারে উপস্থিত হয়ে আমার লজ্জার কারণ না হয়ে দাঁড়ায়। দারুল উলুম দেওবন্দ সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় নয় যে, উস্তাদ সবক পড়ায়ে দিলেন। আর ছাত্ররা সবক পড়ে নিল। আল্লাহ তা'আলার সামনে জবাবদেহীর চিন্তায় দারুল উলুম দেওবন্দ গঠিত হয়েছে, তৈরী হয়েছে তাক্বওয়া ও পরহেজগারীর চিন্তা নিয়ে। অতএব, যে সময়টুকু আমরা বিক্রি করে দিয়েছে তা আমানত। তাতে খেয়ানত করা উচিত নয়।

আজ অধিকার আদায়ের বিপ্লব চলছে

বর্তমান বিশ্বে অধিকার আদায়ের জন্যে আন্দোলন চলছে। অধিকার আদায়ের জন্যে সভা সমিতি ও বিক্ষোভ করা হচ্ছে। স্লোগান লাগানো হচ্ছে। আর দাবী উত্থাপন করা হচ্ছে যে, আমাদের অধিকার দিয়ে দাও, সকলেই এ দাবী তুলছে যে, আমার প্রাপ্য আমাকে দাও। কিন্তু কারো কোন প্রাকারের কল্পনাও আসেনা যে, আমার নিকট অন্যের প্রাপ্যও রয়েছে। তা আমি যথারীতি আদায় করছি কি না? বর্তমান বিশ্বে সকলেরই এ দাবী আমার বেতন বৃদ্ধি করতে হবে, আমার পদোন্নতি করতে হবে। কিন্তু আমাকে যে, দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তা আমি আদায় করছি কিনা? সে ব্যাপারে কোন চিন্তা-ভাবনাই নেই।

সকলকেই নিজ দায়িত্বের প্রতি যত্নবান হতে হবে

আসল কথা হলো যে, যতদিন পর্যন্ত আমাদের এ ধরনের মানসিকতা থাকবে যে আমি অন্যের নিকট থেকে অধিকারের দাবী করবো। আমার নিকট হতে কোন অধিকার আদায় করা যাবে না। আমি আমার দায়িত্বের প্রতি অমনোযোগী থাকবো এবং অন্যের নিকট হতে দাবী আদায় করতে থাকবো। স্মরণ রাখুন! এ অবস্থায় পৃথিবীর বুকে কারো কোন অধিকার আদায় হবে না।

অধিকার আদায়ের পথ একমাত্র একটাই তা হচ্ছে আল্লাহ ও তদ্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশিত পথ। সকল ব্যক্তিকেই নিজের দায়িত্বের প্রতি যথাযথ যত্নবান থাকতে হবে। আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে তা আমি আদায় করছি কি? এ অনুভূতি যখন এসে যাবে তখনই সকল অধিকার আদায় হয়ে যাবে। স্বামীর অন্তরে যদি এ প্রেরণা জাগ্রত হয় যে, আমার উপর স্ত্রীর যে অধিকার রয়েছে তা আদায় করে দিব। তাহলে স্ত্রীর অধিকার আদায় হয়ে যাবে। স্ত্রীর অন্তরে যখন এ অনুভূতি সৃষ্টি হবে যে আমার নিকট স্বামীর যে অধিকার রয়েছে তা আমি আদায় করে দিব। তাহলে স্বামীর অধিকার আদায় হয়ে যাবে। শ্রমিকের অন্তরে যখন এ অনুভূতি জাগবে যে, আমার নিকট মালিকের যে অধিকার রয়েছে তা আমি আদায় করে দিব। এতে মালিকের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। মালিকের অন্তরে যখন এ অনুভূতি সৃষ্টি হবে যে, আমার নিকট শ্রমিকদের যে অধিকার রয়েছে তা আমি পরিশোধ করে দিব। তখন শ্রমিকের অধিকারও নিশ্চিত হয়ে যাবে। যতদিন মানব সমাজে এ অনুভূতির সৃষ্টি হবে না, ততদিন পর্যন্ত অধিকার আদায়ের কেবলমাত্র স্লোগানই লাগানো হবে, অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আয়োজন করা হবে সেমিনার আর বিক্ষোভ প্রদর্শন হতেই থাকবে। কিন্তু কারো কোন অধিকার আদায় হবে না। যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার সম্মুখে জবাবদিহিতার অনুভূতি না আসবে যে, আমাকে আল্লাহ তা'আলার সামনে তাঁর হক্কসমূহ সম্পর্কে জবাবদিহী হতে হবে। দুনিয়াতে শান্তি ও নিরাপত্তার কেবল এই একটি পথই আছে। তা ব্যতীত আর অন্য কোন পথ নেই।

সেটাও হবে মাপ ও ওজনে কম দেয়া

বস্তুত: এ সময়টুকু আমাদের নিকট আমানত। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

«وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِيْنَ * اَلّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ *
وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْوَزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ (المطففين : ٣)

"যারা মাপে কম করে তাদের জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। যখন অন্যের নিকট থেকে মেপে নেয় তখন পরিপূর্ণ ভাবেই আদায় করে। যাতে করে সামান্যতমও কম না হয়। কিন্তু যখন অন্য লোকদেরকে মেপে দেয়ার প্রয়োজন হয় তখন কম করে দেয় এবং ডাণ্ডি হেলিয়ে দেয়।" এ সকল প্রকৃতির লোক সম্পর্কে আল্লাহর ঘোষণা এই যে, তাদের জন্যেই রয়েছে বেদনা দায়ক শাস্তি।

মানুষ ধারণা করে যে, মাপ এবং ওজনে কম তখনই হয় যখন মানুষ কোন বস্তু বিক্রি করে এবং তাতে ডাণ্ডি হেলিয়ে দেয়। অথচ উলামাগণ বলেন যে, اَلتَّطْفِيْفُ فِىْ كُلِّ شَىْءٍ। অর্থাৎ মাপ ও ওজনে কম সর্বপ্রকার বস্তুসামগ্রীতেই হতে পারে। সুতরাং কেউ যদি আট ঘন্টার চাকুরী করে আর সে ব্যক্তি যদি পূর্ণ আট ঘন্টা দায়িত্ব পালন না করে তাহলে সেও মাপ ও ওজনে কম করলো এবং সেই শাস্তির যোগ্য হবে। সে দিকে সতর্ক থাকতে হবে।

পদ ও দায়িত্বের অনুভূতি

বর্তমান বিশ্বে আমাদের উপর যা ঘটছে তা হচ্ছে, যদি কারো সরকারী কোন অফিসে কোন প্রকারের কাজ থাকে তখন তার উপর কিয়ামত নেমে আসে। তার কাজ অতি সহজে সই হয়না। বার বার অফিসে ঘোর-পাক লাগাতে হয়। কখনও অফিসার তার আসনে থাকেনা, কোন সময় বলা হয় আজকে কাজ হবেনা, আগামী কাল আসবে। পরের দিন আসলে তখন বলা হয় আগামী পরশু দিন আসবে। বারংবার ঘোর পাক লাগানোই হচ্ছে। এর কারণ হচ্ছে স্বীয় দায়িত্ববোধ ও আমানতের অনুভূতি শক্তির অভাব। যদি কারো নিকট কোন পদ থাকে, তা হলে এতে কোন কল্যাণ বা সফলতা নেই। তা কোন ফুলের বস্তু নয়। বরং তাহলো দায়িত্বের একটি জিম্মাদারী। রাজত্ব নেতৃত্ব পদ এসব কিছুই দায়িত্বের একটি জিম্মাদারী। ইহা এমন একটি দায়িত্ব যে, হযরত ফারুক (রা.) বলতেন ফুরাত নদীর তীরে যদি কোন একটি কুকুর তৃষ্ণায় মারা যায় তাহলে আমার ভয় হয় না জানি কিয়ামতের দিন আমাকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, হে উমর (রা.) তোমার শাসনামলে অমুক কুকুরটি ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় মারা গিয়েছিল।

এমন ব্যক্তিকে কি খলিফা নিযুক্ত করবো?

বর্ণিত রয়েছে যে, যখন উমর ফারুক (রা.)কে প্রাণনাশের জন্যে আক্রমণ করলো এবং তিনি গুরুতর আহত হলেন, তখন কিছু সংখ্যক সাহাবায়ে কেরাম (রা.) তার খিদমতে উপস্থিত হয়ে আবেদন করলেন, হযরত! আপনি দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে যাচ্ছেন। আপনার পর প্রতিনিধি কে হবেন? নাম ঘোষণা করুন, তাহলে আপনার পর তিনি রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। আর কতক সাহাবাগণ প্রস্তাব পেশ করলেন যে, আপনার পুত্র আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা.) এর নাম ঘোষণা করুন। তাহলে আপনার পর তিনি খলিফা হয়ে যাবেন। হযরত উমর ফারুক (রা.) প্রথমেই উত্তরে বললেন, না! তোমরা কি আমার দ্বারা এমন ব্যক্তিকে খলিফা নিযুক্ত করতে চাও যে তার স্ত্রীকে তালাক দিতে জানে না?

(তারীখুল খুলাফা লিসসূয়ূতী পৃঃ ১১৩) "ঘটনা হলো এই, একদা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.) স্বীয় স্ত্রীকে হায়েজের অবস্থাতে (ঋতুস্রাব) তালাক দিয়ে ছিলেন। আর মাসআলা হলো যে, মহিলাদের ঋতুস্রাবের অবস্থাতে তালাক দেয়া না জায়েজ। আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা.) এর এ মাসআলা জানা ছিল না। যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ঘটনা সম্পর্কে অবগত হলেন, তখন তিনি বললেন যে, তুমি ভুল করেছ। তাই তুমি তোমার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিয়ে আস। পরে যদি তালাক দিতেই হয় তাহলে পবিত্র অবস্থায় তালাক দিবে। হযরত উমর (রা.) এ ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করলেন যে, তোমরা এমন ব্যক্তিকে খলিফা নির্বাচন করতে চাও যে তার স্ত্রীকেও তালাক দিতে জানে না।" *(তারীখুত তাবারী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৯২)*

হযরত উমর (রাঃ)-এর দায়িত্বের অনুভূতি

পরক্ষণে হযরত উমর (রা.) তাদেরকে দ্বিতীয় উত্তর দিলেন যে, খেলাফতের দায়িত্বের বোঝা খাত্তাব বংশের সন্তানদের মধ্যে এক জনের গলায় লেগেছে। তাই যথেষ্ট। আমার এ বংশের অন্য কারো উপর এ দায়িত্ব আসুক তা আমি চাইনা। বার বৎসর পর্যন্ত এ ভার আমার উপর ছিল। আমার জানা নেই যে, যখন আল্লাহ তা'আলার সম্মুখে আমার এ দায়িত্বের হিসাব দিতে হবে, তখন আমার কি অবস্থা হয়। হযরত উমর (রা.) এমন ব্যক্তি যিনি নিজেই রাসূলে কারীম (সা.) এর পবিত্র মুখ থেকে সু-সংবাদ শুনেছিলেন। যে عُمَرُ فِى الْجَنَّة অর্থাৎ উমর (রা.) "জান্নাতী"। এ সু-সংবাদ প্রাপ্তির পর বেহেশতে না যাওয়ার কোন সম্ভাবনাই থাকতে পারেনা। কিন্তু তা সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলার সমীপে আমানতের বিষয়ে হিসাব প্রদানের ভয়ে এতই অনুভূতিশীল ছিলেন।

(*তারীখুত তাবারী* ঃ ৩/২৯২)

এক পর্যায়ে তিনি বলে উঠলেন যে, কিয়ামতের দিনে আমার এ আমানতের হিসাবের ফলাফল যদি সমান হয়ে আমি বেঁচে যাই আমার কোন গুনাহ নেই এবং কোন ছাওয়াবও নেই। তাই আমার জন্য যথেষ্ট হবে। ফলে আমাকে আরাফে পাঠিয়ে দেয়া (যা বেহেশত ও দোযখের মধ্যবর্তী একটি স্থান, যেখানে সে সকল লোকদেরকে রাখা হবে যাদের গুনাহ ও ছাওয়াব সমান হবে) এও আমার জন্য মন্দ নয়। এতে আমি মুক্তি পেয়ে যাব। প্রকৃতপক্ষে এ আমানতের যে জিম্মাদারী আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে প্রদান করেছেন যদি তার সামান্য চিন্তা আমাদের অন্তরে জাগ্রত হয়, তাহলে আমাদের সকল সমস্যাবলিই সমাধান হয়ে যাবে।

প্রধান জাতীয় সমস্যা হলো খেয়ানত

এককালে এ আলোচনা চলতেছিল যে, পাকিস্তানের এক নাম্বার সমস্যা কী? অর্থাৎ সবচেয়ে বড় বিপদ কী? যার সমাধান অগ্রাধিকার দেয়া হবে। প্রকৃতপক্ষে এক নাম্বার সমস্যা হলো "খেয়ানত"। বর্তমান বিশ্বে আমাদের অন্তরে আমানতের গুরুত্ব বিদ্যমান নেই। নিজেদের দায়িত্ব আদায় করার অনুভূতি আমাদের অন্তর থেকে উঠে গিয়েছে। আল্লাহ তা'আলার সামনে জবাব দেওয়ার অনুভূতি অবশিষ্ট নেই। জীবনের গতি খুব দ্রুত চলছে, যেখানে পয়সার প্রতিযোগিতা চলছে। খাওয়ার প্রতিযোগিতা চলছে।নেতৃত্বের প্রতিযোগিতা চলছে। আধুনিক বিশ্বে একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। আল্লাহ তা'আলার সামনে উপস্থিত হওয়ার কোন চিন্তা নেই। বর্তমানে সর্বাপেক্ষা জটিল সমস্যা এবং সকল রোগের মূল এটাই। আল্লাহ তা'আলা আমাদের অন্তরে এ অনুভূতি জাগিয়ে দিলে সকল বিষয়ই সুশৃঙ্খল হয়ে যাবে।

অফিসের আসবাবপত্র আমানত

যে অফিসে আপনি চাকুরী করছেন সে অফিসে যে আসবাবপত্র রয়েছে এসব কিছুই আপনার নিকট আমানত। কারণ সে সকল আসবাব পত্র আপনাকে এ জন্যেই দেয়া হয়েছে যে, এগুলি অফিসিয়াল কাজে ব্যবহার করবেন। সুতরাং তা আপনার ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করতে পারবেন না। কেননা ইহাও আমানতের খেয়ানত। মানুষ ধারণা করে থাকে যে, অফিসের সাধারণ জিনিস ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করতে কিসের অসুবিধা? জেনে রাখুন খেয়ানত ছোট জিনিসে হোক কিংবা বড় জিনিসে হোক উভয়ই হারাম এবং গুনাহে কবীরা। উভয়েই রয়েছে আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতা। সে জন্যেই এ দু'টো থেকেই বেঁচে থাকা অপরিহার্য।

সরকারী জিনিস হলো আমানত

যেমনিভাবে আমি বলেছিলাম যে, "আমানতের" সঠিক অর্থ হলো এই যে, কোন ব্যক্তি আপনার প্রতি বিশ্বস্ত হয়ে, নিজের কোন কাজ আপনার দায়িত্বে ন্যস্ত করলো, অতঃপর আপনি তার ধারণা অনুযায়ী সে কাজের সমাধান দেননি, তাহলে তাই হবে খেয়ানত। এ সড়কসমূহ যার উপর দিয়ে আপনি চলাচল করে থাকেন, এ বাসগুলো যার মাধ্যমে আপনি ভ্রমন করে থাকেন। অর্থাৎ এ গুলিকে বৈধ পন্থায় ব্যবহার করা প্রয়োজন। আর যদি সঠিকভাবে ব্যবহার না করা হয় তাহলে তা খেয়ানতের মধ্যে গণ্য হবে। মনে করেন এগুলি ব্যবহারকালীন দুর্গন্ধযুক্ত করে ও ময়লাযুক্ত করে দিলেন। বর্তমানকালে মানুষ সড়ক, মহা

সড়কসমূহকে নিজেদের মালিকানাধীন মনে করে থাকে। কেউ রাস্তা কেটে ড্রেন করে পানি বের করে। কেউ সড়ক ঘিরে সামিয়ানা টেনে দেয়। অথচ মুফতীগণ এমনও লিখেছেন যে, যদি কোন ব্যক্তি তার বাড়ীর পানির নালা রাস্তার দিকে বের করে দেয়, তাহলে সে ব্যক্তি এমন এক খোলা জায়গা ব্যবহার করল যাতে তার মালিকানা নেই। সুতরাং তার জন্যে রাস্তার উপর পানির নালা ছেড়ে দেয়া বৈধ নয়। যদিও সে পানির নালা কোন জায়গা আচ্ছন্ন করে রাখেনি। বরং খোলা জায়গার একটি অংশে ঐ পানির নালা বের করেছে। তার উপর ভিত্তি করে ফুকাহায়ে কেরামগণ বিষদ আলোচনা করেছেন যে কোথায় পানির নালা করা বৈধ, কতটুকু করা বৈধ, কতটুকু অবৈধ।

হযরত আব্বাস (রা.)এর ড্রেন

হযরত আব্বাস (রা.) যিনি নবী করীম (সা.) এর চাচা ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা রয়েছে। তার ঘর ছিল মসজিদে নববীর অতি সন্নিকটে। তার ঘরের ড্রেন মসজিদে নববীর চত্বর দিয়ে প্রবাহিত হতো। একদা হযরত উমর (রা.) এর দৃষ্টি সে ড্রেনের প্রতি পড়লে তিনি দেখতে পেলেন যে, সে ড্রেনটি মসজিদ চত্বরে গড়িয়ে পড়ছে। লোকদেরকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন যে এ ড্রেনটি কার যা মসজিদ চত্বরের দিকে প্রবাহিত হচ্ছে? লোকেরা বলল যে, এ ড্রেনটি হুজুর (সা.) এর চাচা হযরত আব্বাস (রা.) এর। তিনি নির্দেশ দিলেন যে, ওটা বন্ধ করে দাও। মসজিদের দিকে কারো ড্রেন নির্গত করা জায়েজ নয়।

হযরত আব্বাস (রা.) যখন সংবাদ পেলেন, তখন সাক্ষাৎ করার জন্য হযরত উমর (রা.) এর নিকটে এসে বললেন হে উমর! আপনি এ কি করলেন! তিনি প্রতি উত্তরে বললেন এ ড্রেনটি মসজিদে নববীর চত্বরে প্রবাহিত হচ্ছে বিধায় বন্ধ করে দিয়েছি। হযরত আব্বাস (রা.) বললেন এ ড্রেনের অনুমতি আমি নবী করীম (সা.) এর নিকট থেকে গ্রহণ করেছিলাম। হযরত উমর (রা.) যখন একথা শুনলেন যে তিনি হুযূর (সা.) এর অনুমতি ক্রমেই তা করেছিলেন, তৎক্ষণাৎ বললেন যে, আপনি আমার সথে চলুন! সুতরাং মসজিদে নববীতে গিয়ে তিনি নিজেই রুকুর অবস্থায় দাঁড়িয়ে হযরত আব্বাস (রা.) কে বললেন, হে আব্বাস! আল্লাহর ওয়াস্তে আমার পিঠে আরোহণ করে এ ড্রেনটি পুনঃ লাগিয়ে দেন। এ জন্যে যে, খাত্তাব এর সন্তানের এ স্পর্ধা যে, সে রাসুলে কারীম (সা.) এর অনুমতি ক্রমে প্রদানকৃত ড্রেন ভেঙ্গে দেবে? হযরত আব্বাস (রা.) বললেন যে, তা আমি নিজে মেরামত করে নেব। কিন্তু হযরত উমর (রা.) বললেন যে, না আমি যখন ভেঙ্গেছি, তাই আমিই এর শাস্তি আস্বাদন করব। বস্তুত শরীয়তের মূল বিধান ছিল যে প্রশাসনের অনুমতি ব্যতিরেকে সে ড্রেন নির্গত করা জায়েজ

নয়। কিন্তু যেহেতু হযরত আব্বাস (রা.) হুযূর (সা.) এর অনুমতি নিয়েছিলেন। সে জন্যেই তা নির্গত করা তার জন্যে জায়েজ হয়ে গেল। (*তবকাতে ইবনে সাআদ*, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ২০)

বর্তমান পরিস্থিতি হলো এই যে, যার যতটুকু জমীন প্রয়োজন হয় তা দখল করে নেয়। তবে আমরা গুনাহ করতেছি বলে এ ধরনের কোন ভাবনাই নেই। নামায পালন করা হচ্ছে এবং এ জাতীয় খেয়ানতও করা হচ্ছে। এ সবকিছুই আমানতে খেয়ানত করার অন্তর্ভুক্ত। এ থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক।

মজলিসের কথোপকথন

اَلْمَجَالِسُ بِالْاَمَانَةِ অর্থাৎ মজলিসে যে আলোচনা করা হয়, ইহা শ্রোতাদের নিকট আমানত (*জামেউল উসূল*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৫৪৫)। যেমন দুই-তিন জন ব্যক্তি পরস্পর কোন কথা বলছে। অনিচ্ছাকৃতভাবে কোন গোপন কথা যদি বলে ফেলে, তাহলে এ তথ্যসমূহ তাদের অনুমতি ব্যতীত অন্যের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়াও খেয়ানতের মধ্যে গণ্য ও অবৈধ। যেমন কতক মানুষের স্বভাব যে একজনের কথা অপরজনের নিকট লাগিয়ে দেয়া এবং সকল ঝগড়া-ফাসাদ সৃষ্টি করা। বস্তুত যদি মজলিসের মধ্যে এ ধরনের আলোচনা করা হয়, যার মাধ্যমে অন্য ব্যক্তির ক্ষতির আশঙ্কা থাকে। যেমন দুই তিন জন মানুষ মিলে এ সিদ্ধান্ত করলে যে অমুক সময় অমুক ব্যক্তির উপর আক্রমন করব। এখন উচিত হবে যে এ ধরনের কথা গোপন না করা। বরং সে ব্যক্তিকে জানিয়ে দেয়া যে, তোমার বিরুদ্ধে এ সিদ্ধান্ত হয়েছে। কিন্তু যে সকল ক্ষেত্রে এ ধরনের কিছু না হয় সে সকল ক্ষেত্রে কোন গোপন ভেদ অন্যের নিকট প্রকাশ করা জায়েজ নয়।

গোপনীয় কথা আমানত

কোন কোন সময় এমন হয়ে থাকে যে, মজলিসের মধ্যে কেউ কোন গোপনীয় কথা শুনল, সে অন্যের নিকট গিয়ে গুরুত্ব সহকারে বলে দিল যে ইহা গোপন বিষয়। আমি তোমাকে শুনিয়ে দিলাম, তা অন্য কারো নিকট বলবেনা। এখন সে বুঝে নিল যে, গুরুত্বের সাথে গোপন বিষয়ের সংরক্ষণ করে নিয়েছি, তা ভবিষ্যতে অন্য কারো নিকট বলবে না। এখন এই শ্রবণকারী তৃতীয় ব্যক্তির নিকট গোপন বিষয় বলে দিয়ে বলল যে, তা গোপন বিষয় ভবিষ্যতে অন্য কারো নিকট বলবেনা। আর এ ধারা এমনি ভাবে চলতে থাকে এবং সে বুঝে থাকে যে, আমরা আমানতের প্রতি গুরুত্ব দান করেছি। বস্তুত সে বিষয়টি যেহেতু গোপন তথ্য ছিল, সেজন্য অন্যকে বলে দেয়া থেকে নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং অন্যের নিকট এমন গুরুত্বের সাথে বলে দেয়াও আমানতের পরিপন্থি, এটা হবে খেয়ানত নাজায়েজ।

টেলিফোনে অপরের কথা শ্রবণ করা

দুইজন মানুষ আপনার থেকে পৃথক হয়ে পরস্পরে কানাঘুষা করছে। আপনিও চুপিসারে তাদের কথা শুনার জন্য লেগে গেলেন, যে তাদের কথা শুনব তারা কি বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করছে। তাও আমানতের খেয়ানত। অথবা টেলিফোন করার সময় আপনার ফোন লাইন অন্যের টেলিফোনের সাথে মিলে যায়, এবার আপনি তাদের কথা শুনতে লাগলেন এসবকিছুই আমানতের খেয়ানত ও অন্যের দোষ অনুসন্ধানের অন্তর্ভুক্ত। এগুলো হলো নাজায়েজ। অনন্তর বর্তমানে এর উপর গর্ব করে থাকে যে, আমি অমুক ব্যক্তির গোপন রহস্য জেনে ফেলেছি। আর তাকে বড় বুদ্ধিমান ও বড় তথ্য বিশেষজ্ঞ মনে করা হয়। অথচ নবী করীম (সা.) এরশাদ করেন যে, তা খেয়ানতের অন্তর্ভুক্ত ও নাজায়েজ।

সারসংক্ষেপ

মোদ্দাকথা হচ্ছে যে, আমানতের খেয়ানত বলতে বুঝায় জীবনের কোন ক্ষেত্রই নেই যেখানে আমানতের বিধান নেই এবং খিয়ানত থেকে আমাদেরকে বাধা দেওয়া হয়নি। আমি যা কিছু আলোচনা করেছি এসব কিছুই আমানতের পরিপন্থি এবং নিফাকের (কপটতা) অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এ হাদীস সর্ব অবস্থায়ই স্মরণ রাখা উচিৎ যে, তিনটি বস্তু মুনাফিকের নমুনা। (১) মিথ্যা কথা বলা (২) অঙ্গীকার ভঙ্গ করা এবং (৩) আমানতের খেয়ানত করা। আল্লাহ আমাদের সকলকে হেফাযত করুন। এ সকলই দ্বীনের অংশ। আমরা দ্বীনকে খুবই সংকীর্ণ মনে করে থাকি। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এ সকল বিষয়কে পশ্চাতে ফেলে রেখেছি। আল্লাহ তা'আলার স্বীয় রহমতে আমাদের অন্তরে বুঝ দান করুন এবং নবী করীম (সা.) এর নির্দেশিত পথে চলার তৌফিক দান করুন। আমীন।

واخر دعوانا ان الحمد رب العالمين

(সমাপ্ত)